মোসলেম প্রতিভা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত।

মাঘ—১৩৪২

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উমাশঙ্কর প্রেস
প্রিণ্টার—
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙার
১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রী
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

মোসলেম গগনের প্রদীপ্ত মিহির

সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী

আভিজাত্য-সমাজের মুকুটমণি

সহৃদয়, সদাশয়, দানবীর

বঙ্গেশ্বরের বিচক্ষণ সচিব

রতনপুরের প্রজাবৎসল নবাব

অনারেবল্ স্যর নবাব কে, জি, এম্ ফারোক্বি

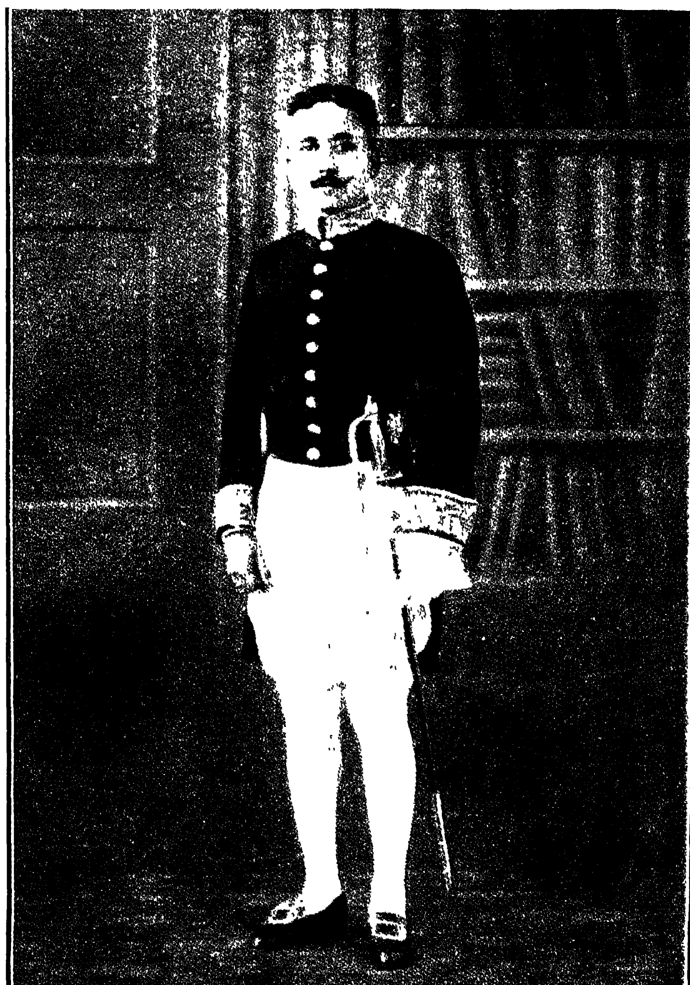
সাহেবের উদ্দেশে

মোসলেম-প্রতিভা

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পিত হইল



The Hon'ble Nawab
Sir Mohiuddin Faroqui, M L. C., Kt. of Ratanpur
Leader of the Bengal Legislative Council.

(রতনপুরের মাননীয় নবাব বাহাদুর)

সূচীপত্র

মোসলেম-প্রতিভা

হাজি মহম্মদ মহসিন

হাজি মহম্মদ মহসিন অতীব সদাশয় লোক ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহার পিতামহ বাণিজ্য করিবার জন্য পারশ্য হইতে মুর্শিদাবাদ সহরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তিনি রপ্তানী-কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং মুর্শিদাবাদের সম্পত্তি তাঁহার পুত্র হাজি ফৈজুল্লার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিজে হুগলীতে আসিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে প্রভূত অর্থ নিয়োগ করায় তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তিনি গরীব হইয়া পড়েন। তখন পিতা-পুত্রে মিলিয়া হুগলিতে অতি সামান্য রকমে ব্যবসায় করিতে থাকেন। এই সময়ে আগা মোতাহার নামে আর একজন পারশ্যবাসী দিল্লী হইতে হুগলীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একমাত্র কন্যা মান্নুজান খানুমকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কন্যাকে তিনি বিস্তৃত সম্পত্তি দান করিয়া যান। কিছুদিন পরে আগা মোতাহারের বিধবা পত্নী হাজি ফৈজুল্লাকে

বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহসিনের জন্ম হয়। শৈশব ও বাল্যকাল তিনি বিশেষ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দশ বৎসর বয়সে মহসিন আগা শিরাজী নামক এক গৃহশিক্ষকের নিকট আরবী ও ফার্শী শিখিতে থাকেন। পরে মুর্শিদাবাদ মক্তবে গিয়া শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মক্কায় চলিয়া যান। যথানিয়মে তীর্থ বা হজ করিয়া তিনি "হাজী" উপাধি পান। অতঃপর মিশর, তুস্কর, পারশ্য ও কারবালা এবং অন্যান্য মুসলমান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ২৮ বৎসর পরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে উপস্থিত হন। নবাব আসফউদ্দৌলা তাঁহাকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে শান্তিতে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় শেষ জীবন যাপন করিবার মানসে আইসেন। ইত্যবসরে তাঁহার ভগিনী মান্নুজান খানুমের সহিত মির্জ্জা সালাহুদ্দীন মহম্মদ খাঁর বিবাহ হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তখন তাঁহার ভগিনী মান্নুজান মহসিনকে তাঁহার বিরাট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহসিন অগত্যা মুর্শিদাবাদ হইতে হুগলীতে আসিয়া ভগিনীর বিরাট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগিনীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া মহসিনকে দিয়া যান। মহসিন বিবাহ করেন নাই। তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক, অনশনক্লিষ্ট বিধবা ও নিরাশ্রয় বালক-বালিকাকে খুঁজিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনি কোরাণের এমন নকল করিয়া ছিলেন যে, তাহা ঠিক ছাপার অক্ষরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তিনি সেই কোরাণের নকল দরিদ্র মুসলমানদিগকে দান করিতেন। ইহাতে তাঁহার যে কিরূপ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু যে জন্য তিনি আজ সর্ব্বজনমান্য সে কারণ হইতেছে এই যে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তিনি তাঁহার দেড় লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি জনহিতকর কার্য্যে দান করেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হুগলীর ইমাম-বাড়া উদ্যানে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়। এইখানে তাঁহার ভগিনী মান্নু-জান খানুমেরও সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে মহসিনের সমাধির উপর ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি চাঁদোয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি বদান্যতাগুণে যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ, সি-আই-ই

নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ, সি-আই-ই বাগদাদের সাহ আনিদুদ্দীনের বংশধর। সাহ আনিদুদ্দীনকে সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং ফরিদপুর জেলায় তাঁহাকে কিছু লাখেরাজ জমি দান করেন। তাঁহার বংশধর কাজী আবদুর রসুলকে দিল্লীর অধিপতি "কাজী" উপাধি দেন। তিনিও ফরিদপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই বংশের ষষ্ঠ বংশধর কাজী ফকির মহম্মদ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং তিনি সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তিনি উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পার্শী ভাষায় "জগতের ইতিহাস" রচনা করিয়াছিলেন।

নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ ইঁহারই পুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ৩৫ বৎসরকাল তিনি সবিশেষ যোগ্যতার সহিত সরকারের কর্ম্ম করেন। তিন তিন বার তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা-প্রচারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্বসমাজের জন্য তাঁহার এই নিঃস্বার্থ কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। স্যার উইলিয়ম তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—তিনি "the most distinguished Mussalman reformer of the day." স্যর রিচার্ড টেম্পেল লিখিয়াছিলেন—"The most enlightened and progressive among the Mahomedans of Bengal." ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবাব আব্দুল লতিফ ভূপালের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তিনি কলিকাতায়

মুসলমান সাহিত্যসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে পরে আর যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্য-সভা হইয়াছে তৎসমস্তই এই সাহিত্য-সভার অনুকরণে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন কমন্স মহাসভায় বলেন, "Represented Mohamedan feeling in its best form, both here and throughout India." গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পর পর "খাঁ বাহাদুর" ও "সি-আই-ই" উপাধি প্রদান করেন। তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে "অর্ডার অব. দি মেডজিদি" উপাধি প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড রিপণ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"The Government of India has not had a more faithful, zealous and loyal servant than yourself and I congratulate you in your long and honourable career". ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় তিনি আহত তুরস্কের সৈন্য, বিধবা ও অনাথ-অনাথাগণের জন্য চাঁদা তুলিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালের ৫ই জুলাই বেলা ৪—৩৫ মিনিটের সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করিয়া বলেন, নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ ভারতবাসী ও গভর্ণমেণ্ট উভয়ের নিকটই নেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বঙ্গদেশের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রেসিডেন্সী কলেজ যাঁহারা স্থাপন করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে মুসলমান সম্প্রদায় যে কখনও বর্ত্তমান সময়ে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। তাঁহারই প্রাণপণ পরিশ্রমে ইলিয়ট

মুসলমান হোষ্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেণ্ট্রাল মুসলমান হোষ্টলেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইলিয়ট হোষ্টেলে তাঁহার একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞান অনুশীলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রতিবৎসর মুসলমান সাহিত্য-সভায় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কথোপকথনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সভাসমিতিতে যোগ দিতেন। লর্ড কারমাইকেলও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

১৯১৮ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট ইলিয়ট মাদ্রাসা হোষ্টেলে তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সোমবার নবাব আব্দুল লতিফ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ভারতের নানা স্থান হইতে তারের বার্ত্তা ও চিঠিপত্র আসিতে থাকে। ঐ সালের আগষ্ট মাসে টাউন হলে একটি বিরাট সভা করিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রধান বিচারপতি স্যর উইলিয়ম কোমার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যেদিন মারা যান, তৎপরদিনের যাবতীয় সংবাদপত্র তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ন মিরর, ষ্টেটস্‌ম্যান, পাইওনীয়ার প্রভৃতি সমস্ত পত্রই তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আব্দুল ফজল মহম্মদ আবদুর রহমন। তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। সরকার তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর ও নবাব বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা স্মল কজেস

কোর্টের জজ হন। তিনি মুসলমান সাহিত্য-সভার অনারারি সেক্রেটারী ছিলেন। ইউরোপ, তুরস্ক, এশিয়া মাইনর, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মক্কায় যাইয়া "হজ" করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য। মুসলমান-সমাজের শিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে যে দরবার হয় তিনি সেই দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র। তাঁহার নাম নবাবজাদা আবু সরক মহম্মদ লতিফর রহমন, এম্-এ (কাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল।

নবাব আব্দুল লতিফের মধ্যম পুত্র মৌলবী এ-কো আব্বাস সুভান ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি অনেক জেলাতে কাজ করিয়াছিলেন এবং যোগ্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গয়া জেলার জাহানাবাদে যখন তিনি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তথায় হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তিনি সে হাঙ্গামা শান্তির সহিত মীমাংসা করিয়াছিলেন।

নবাব বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র নবাবজাদা আব্দুল ফতা মহম্মদ আব্দুল হাজীজ প্রথমে কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার হন। ১৯০৩ সালে তিনি সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংবাদপত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতা রিভিউ, মোসলেম ইনষ্টিটিউট জার্ণাল এবং অন্যান্য এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি কলিকাতার আঞ্জুমান-ই-উর্দ্দু পত্রের সম্পাদক। মুসলমান যুবক-সম্মিলনীর তিনি সহকারী সভাপতি।

নবাব বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র নবাবজাদা আবুল ফৈজ মহম্মদ আব্দুল আলি, এম্-এ। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কলিকাতার সেনসর করা হইয়াছিল। কিছুদিন তিনি আলিপুরের পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

সম্প্রতি তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ইম্পিরিয়াল-রেকর্ড-রক্ষক তিনি লণ্ডনস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ও রয়াল সোসাইটী অফ লিটারেচারের একজন সভ্য।

খাঁ বাহাদুর নবাব আবদুর রহমানের পুত্র—নবাবজাদা আবু সরফ মহম্মদ লতিফ উর রহমন এম্-এ (কাণ্টাব) ব্যারিষ্টার-এট-ল। ক্যাম্ব্রিজের প্রেমব্রোক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম্-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তিনি এখন স্মল কজেস কোর্টের অন্যতম বিচারপতি।

রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলি

ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা যে সমস্ত নেতা ও মনীষী ব্যক্তি আছেন তন্মধ্যে রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলীর স্থান অতি উচ্চে। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের ভূষণস্বরূপ, দেশের গৌরবস্থল এবং মুসলমান সমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। ভারতে ও ইংলণ্ডে তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী বিচারক বলিয়া খ্যাত।

হুগলী জেলার চুঁচড়া সহরে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আমির আলি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহম্মদের বংশ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্যের রাজাদের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ সাদিক খাঁ শাহ্ আব্বাসের (২য়) অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বংশধর আহম্মদ ফজীল সৈনিক-বৃত্তি করিতেন এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি নাদির শাহের সৈন্যদলে যোগদান করেন। নাদির শাহ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আহম্মদ ফজিল তাঁহার সহিত পারস্যে না ফিরিয়া ভারতবর্ষেই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার দলবল লইয়া দিল্লীর সম্রাটের অধীনে কর্ম্ম করিতে থাকেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন মোগল-রাজধানী আক্রমণ করে, আহম্মদ ফজীলের পুত্র তখন দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যার নবাবের অধীনে কার্য্য করিয়া তাঁহার পুত্রগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সাদ্দাত আলি নামক অন্যতম পুত্র অযোধ্যা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইলে বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন। এই সাদ্দাত আলীই রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলির পিতা।

আমির আলির পিতা দূরদর্শী লোক ছিলেন। যখন সমগ্র মুসলমান সমাজ ইংরাজী শিক্ষার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিত, মোল্লা এবং মৌলবীর শিক্ষাই যখন মুসলমানেরা চরম শিক্ষা বলিয়া মনে করিত, তখন সাদ্দাত আলি আপন পুত্রকে ইংরাজি শিখাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমির আলি হুগলী কলেজেই শিক্ষালাভ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ ও পরবর্ত্তী বৎসরে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম্-এ পাশ করেন।

অতঃপর হুগলী কলেজ হইতেই তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি "মুসলমান ছাত্র-সাহায্য-সমিতি" হইতে সাহায্য পাইতেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমির আলি কিছু-কালের জন্য হাইকোর্টে ওকালতী করেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ইংলণ্ডে যাইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারীতে বিশেষ পশার করিয়া ফেলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য (Fellow) নির্ব্বাচিত হন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর পর পাঁচ বৎসর কাল তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত হন। তদবধি মুসলমান জাতি ও সাহিত্যের কল্যাণের জন্য তিনি যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাহা আজিও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি মুসলমান "আঞ্জুমান" ও সমিতিসমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সমিতি (Central National Mahomedan Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া ২৫ বৎসর কাল উহার সম্পাদকতা করেন। এক সময়ে ভারত সরকারের নিকট

এই সমিতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৭৬—১৯০৪ পর্য্যন্ত আমির আলি হুগলী ইমামবাড়া কমিটিরও সভাপতি ছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী করিবার পর তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এরূপ নিষ্ঠার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছিলেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদের যে কিরূপ দায়িত্ব ও ইহা কিরূপ শ্রমসাধ্য তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি সরকারী বেসরকারী সকল লোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ আমির আলি অধিকদিন সরকারী কাজে থাকিতে পারিলেন না। একেবারে যাহারা স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে সরকারী আওতায় থাকিয়া কাজ করা যৎপরোনাস্তি কষ্টদায়ক। কাজেই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তাঁহার পাকা হইবার জনরব প্রচারিত হইল, তখন তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও উক্ত পদ পরিত্যাগ করিলেন। তখন যদিও অনেকে তাঁহাকে পদত্যাগের জন্য "স্থূলবুদ্ধি," বিবেচনাহীন" প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, আমীর আলি এখন পদত্যাগ করিয়া অতি ভাল কাজই করিয়াছিলেন।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া আমীর আলি পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এবার তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বাড়িয়া উঠে। সরকার ও জনসাধারণের তিনি প্রশংসা অর্জ্জন করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর লর্ড রিপণ তাঁহাকে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কৌন্সিলের সদস্য মনোনীত

করেন। কাউন্সিলের আলোচনায় তিনি অগ্রণীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। যদিও এ সময়ে আমীর আলি জনমতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারেন নাই, তথাচ তাঁহার স্বমতের প্রতি দৃঢ়তা-দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। লর্ড ডাফরিণ একদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সি·আই·ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। ইহাতে মুসলমান সমাজের বিশেষ আনন্দ হয়। তাঁহার পূর্ব্বে সৈয়দ মহম্মদ মাত্র মুসলমানদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন সুতরাং তিনিই দ্বিতীয়। মিঃ আমীর আলি ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে হাইকোর্টের জজীয়তী করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বোধ হয় নাই। লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহাকে বিচারপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার-দর্শনে তাঁহার অতি বড় শত্রুও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারিত না। তিনি বিচারাসনে বসিবার কালে মুসলমান আইন সম্বন্ধে এতদিন হাইকোর্টের বিচারপতিগণের যাহা কিছু অজ্ঞাত ছিল তাহার নিরাকরণ হইল। ওয়াকৃফ আইনঘটিত একটি মোকদ্দমায় ফুল বেঞ্চেতে বিচারের সময়ে তিনি অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া স্বতন্ত্র রায় দিয়াছিলেন, সেই রায় প্রিভি কাউন্সিল কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে যে ওয়াকফ বিল পাশ হয়, তাহা মাননীয় মিঃ আমীর আলিরই চেষ্টার কারণ।

উকিল-ব্যারিষ্টারগণের প্রতি মিঃ আমীর আলি অতি সাধু ব্যবহার করিতেন। কখনও কোন উকিল-ব্যারিষ্টার তাঁহার নামে কোন

অভিযোগ করেন নাই। ব্যবহারাজীবদের যুক্তিতর্ক তিনি অতি মনোযোগের সহিত শুনিতেন। মিঃ আমীর আলির রায়গুলি এত সুন্দর ভাষায় লিখিত এবং সেগুলির এরূপ সুন্দর বর্ণনা-ভঙ্গী যে সাহিত্য-হিসাবে তাহাদের মূল্য নিতান্ত কম নহে।

কলিকাতা হাইকোর্টে চৌদ্দ বৎসর কাল যশের সহিত কার্য্য করিবার পর অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সাহিত্যের চর্চ্চা করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ইংলণ্ডে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তাহা নহে; পরন্তু ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, স্বাধীনতার বাতাসে পরিপূর্ণ ইংলণ্ড জগতের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল—এই বিবেচনায় তিনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তিনি ইংলণ্ডের জনগণ-মুখরিত স্থানে বাস করেন না। বার্কশায়ারে একটি নিভৃত স্থানে তিনি বাস করেন। ইংলণ্ডে থাকিয়াও আমির আলি স্বজাতির কল্যাণ-কামনা ত্যাগ করেন নাই। অবকাশ-সময় তিনি সাহিত্যানুশীলনে অতিবাহিত করেন। "মুসলমান লীগে"র প্রতিষ্ঠা মিঃ আমির আলির জাতিপ্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লণ্ডনে মুসলমান লীগের যে শাখা আছে, তিনি সেই শাখার সভাপতি। এই সমিতির উন্নতিকল্পে এবং জাতীয় মুসলমানদের দাবী ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার গোচর করিতে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একাদিক্রমে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের জন্য যে সমস্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মূলে মিঃ আমির আলির অক্লান্ত পরিশ্রম নিহিত। নবসংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাসমূহে মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি-প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা মিঃ আমির আলির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তিনি যদি শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় লণ্ডনে না থাকিতেন, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার-বিষয়ে মুসলমানেরা পূর্ব্বের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইয়া

পড়িয়া থাকিত। ইণ্ডিয়া আফিসে একজন মুসলমান প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে তাঁহাকেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু উদারনীতিক মুসলমান বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, লর্ড মর্লে তাঁহাকে ইণ্ডিয়া অফিসে নিযুক্ত করেন নাই। ইহাতে ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষ বেশী দিন থাকে না, ১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর মিঃ আমির আলিকে প্রিভি কৌন্সিলের বিচার-পতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করায় সকলেই আনন্দিত হন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী প্রিভি কৌন্সিলের জজীয়তী লাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ আমির আলি যদিও জাতীয় মহাসভার আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তথাচ তিনি সাম্প্রদায়িক দোষ-দুষ্ট নহেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু পুরুষের চেষ্টায় ভারতবর্ষের উন্নতি সাধিত হইবে না, পরন্তু স্ত্রীশিক্ষাও চাই, তিনি এই মতের পোষকতা বরাবরই করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান সমাজের পর্দ্দা-প্রথাও তিনি জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। অনেক মুসলমান অবশ্য তাঁহার মতের পোষকতা করেন না। তিনি বলেন, আমি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসী, তার পর মুসলমান। তিনি ভারতবাসীকে উচ্চ রাজপদে ও সেনা-বিভাগে নিযুক্ত করিবার জন্য, স্বায়ত্ত শাসন-প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন কালেও ভারতবাসী পল্লীপঞ্চায়েৎ দ্বারা আপনাপন গ্রাম শাসন করিতেন। ভারতবর্ষে মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে মিঃ আমির আলি বলেন—"Municipal Government even in England is attended with mistakes, in India they are to be expected. A sympathetic,

tactful and at the same time firm treatment would instead of making failure have led to success. It would have made respectable sections understand the responsibilities of trust imported self-reliance and trained them to a large perception of duty as citizens of a great Empire. "মিঃ আমির আলি ইংরাজি ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রথমে হুগলি কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি একখানা উর্দ্দু পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। অতঃপর ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় তিনি "A critical examination of the life and teaching of Mahomed" নামক পুস্তক লেখেন। তাঁহার "Spirit of Islam" নামক পুস্তকখানি জনসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত। এই পুস্তকখানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছে। 'The Ethics of Islam" গ্রন্থখানি তাঁহার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি "Islam," "A short history of the Saracens" নামক পুস্তকদ্বয়ের রচয়িতা। তিনি এইসমস্ত পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরমত-সহিষ্ণু। "By the laws of Islam, liberty of conscience and freedom of worship were allowed and guaranteed to the followers of every other creed under Moslem dominion".

আমির আলি কয়েকখানি আইনের গ্রন্থও লিখিয়াছেন। তাঁহার "Students' Hand book of Mahomeden law", "Mahomedans", "The law of evidence applicable to British India", "A commentary on the Bengal Tenancy Act", "Civil Procedure in British India", "Ashburners' Mortgages" আইন-ব্যবসায়ীদের নিকট অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

মিঃ আমির আলি অনেক ইংরাজী সাময়িকপত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া

থাকেন। "Nineteenth Century and after" নামক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি মুসলমান আইন, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়া জগতের সমক্ষে মুসলমান জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মুসলমানদের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার Central National Mahomedan Associationএর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং মুসলমানদিগের প্রতিষ্ঠাতা, মুসলমান সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের মূলে তাঁহারই চেষ্টা নিহিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়, তিনি সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর মুসলমান লীগে তাঁহার যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহা ভাষা ও ভাবসম্পদে অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। ১৯০৮ সালে যখন পাশ্চাত্য ভাবে নব্য তুরস্ক অভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তিনি বলেন, তুরস্কের এই প্রকার নবজাগরণ ইস্‌লামধর্ম্মের বিরোধী নহে।

মিঃ আমির আলি মুসলমানসমাজের স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার জীবনে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও প্রাচ্যের ভাব সংমিশ্রিত। তিনি দৃঢ়চেতা, সরকারী বেসরকারী কোন বাদ-প্রতিবাদে তিনি স্বমতকে পরিত্যাগ করেন না। ইউরোপখণ্ডে তিনি ভারতীয় মুসলমান সমাজের অগ্রণী বা প্রতিনিধি এবং ইউরোপ ও ভারতের সংযোগ-সূত্র।

স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যতগুলি মুসলমান জননায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্যর সৈয়দ আহম্মদ তাঁহাদের মধ্যে যে অন্যতম

সৈয়দ আহম্মদ

এ কথা—সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে কিরূপে লোকে আত্মবলে উত্তর কালে দেশে গণ্য মান্য বরেণ্য হইতে পারে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। স্যর সৈয়দ জাতীয় মহাসভার বিরোধী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার জীবনী আলোচনার যোগ্য মনে করেন না। কিন্তু স্বীয় দেশ, জাতি, সমাজ ও সম্প্রদায়ের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার ন্যায় আদর্শস্থানীয় মুসলমান মুসলমান-ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কমই ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রাণাড়ে, দাদাভাই প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিতগণ দেশের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, স্যর সৈয়দ ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও দেশের জন্য তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুল ঘটনা-পরিপূর্ণ জীবনী পাঠ করিলে তাঁহার মনীষা, প্রতিভা ও স্বজাতি-বাৎসল্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভারতে মুসলমান-শিক্ষার প্রধান সংস্কারক স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর দিল্লী নগরীতে একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান

জন্ম

বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদের পৌত্র হজরত হোসেনের তাঁহারা বংশধর। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন। স্যর সৈয়দের পিতামহ সৈয়দ মহম্মদ হাজি

দ্বিতীয় আলমগীরের দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও শক্তিসম্পন্ন সভাসদ্ ছিলেন এবং সম্রাট্ আলমগীরের নিকট হইতে "নবাব জাদ-উদ-দৌলা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দের পিতা সৈয়দ মহম্মদ তাকী দিল্লীর একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক ছিলেন এবং কথিত আছে যে, তিনি সম্রাট্ শাহ্ আলমের প্রধান মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। পিতৃকুল ও মাতৃকুল—উভয়কুল হইতেই আহম্মদের 'সৈয়দ' উপাধি। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মাতা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা আজিজুন্নিসা বেগম মোগল-সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী আজা করিউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। মায়ের প্রযত্নে ও সুশিক্ষায় সৈয়দ আহম্মদের শৈশব ও বাল্য জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সৈয়দ আহম্মদের যখন বাল্যকাল তখন মোগল-গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল। তখন দিল্লীতে বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী কোন বিদ্যালয়ও ছিল না। সৈয়দ আহম্মদ কাজেই ইংরাজী শিক্ষা না পাইলেও আরবী ও পারশী ভাষাতে বেশ সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আইন, ইতিহাস ও ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থার অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন তিনি মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য চাকুরীর অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলেও সৈয়দ আহম্মদ অবসর সময়ে ইংরাজী সাময়িক পত্রাদি পাঠে বিরত হইতেন না। তাহার ফলে তিনি ইংরাজী ভাষায় মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে সদর আমিনের আফিসে সেরেস্তাদার-

পদে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি আগ্রা বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার স্যর রবার্ট হ্যামিলটনের আফিসে নায়েব মীর মুন্‌সীর পদে উন্নীত ও আগ্রাতে বদলী হন। অনন্তর মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৈনপুরীর সদর আমীন বা মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীতে উক্ত সদর আমিনের পদে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজনৌরে স্থানান্তরিত হন। যখন তিনি বিজনৌরের সদর আমিন তখন—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস-বিশ্রুত সিপাহী বিদ্রোহের কালানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিতে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যে প্রাণপণ সাহায্য করেন তাহাতেই তাঁহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিজনৌরে যখন এই বিদ্রোহের শিখা পরিব্যাপ্ত হয় তখন তিনি নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করিয়া অনেক ইংরাজ নর-নারীর জীবন রক্ষা করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি অনেক দেশীয় নিরীহ অধিবাসীরও পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করেন। নতুবা মিথ্যাবাদী গোয়েন্দার কোপে পড়িয়া কত শত স্থানীয় অধি-বাসীর যে ধনপ্রাণ বিদ্রোহী-সন্দেহে নষ্ট হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাঁহার সদুদ্দেশ্য সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি রুষ্ট হওয়ায় তিনি বিজনৌর হইতে হালদুর, হালদুর হইতে মীরাট, তদনন্তর দিল্লীতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। গুণগ্রাহী ব্রিটিশ সরকার সৈয়দ আহম্মদের উপকার বিস্মৃত হইলেন না। বিজনৌরের কলেক্টর মিঃ সেক্‌স্‌পীয়র তাঁহাকে বাৎসরিক দেড় লক্ষ রাজস্ব আয়ের একটি তালুক দিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ তাহা গ্রহণ করিলেন না। সৈয়দ আহম্মদের গুণপণা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরার্থে উক্ত কলেক্টর সাহেব

কর্ম্মজীবন

লিখিয়াছিলেন—"If I were required to draw a distinction, I should do so in favour of Syed Ahmed Khan, whose clear sound judgment and rare uprightness and zeal could scarcely be surpassed. I feel assured his official character is well established that independent of his special services during this crisis, his promotion to a Principal Sudder Ameenship might be looked upon as certain, and I trust he may soon obtain this promotion. But, in addition to this, I recommend that, in appreciation of his peculiar claims to reward, as having been mainly instrumental in securing the escape of the whole of the Bijnore party of Europeans and of his subsequent services, when the district was made over to him and the Deputy Collector, he should receive a pension in perpetuity, or for his own life and that of his eldest son, of Rs. 200 per mensem."

কলেক্টরের অনুমোদন কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরের সবজজ্ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আলিগড়ে ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতেও তিনি উক্ত সবজজস্বরূপে কার্য্য করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি বিখ্যাত "এডুকেশন কমিশনের" সভ্য মনোনীত হন। আলিগড় হইতে তিনি বিশেষ কার্য্যের জন্য আহুত হওয়ায় চাকুরি পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার শূন্য পদে তদীয় পুত্র মামুদ উপবেশন করেন। মিঃ মামুদ পরবর্ত্তীকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড ডাফরিণ কর্ত্তৃক Public

Service Commissionএর অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে এদেশে থাকিয়াই যাহাতে ভারতীয়গণ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তিনি মুক্তকণ্ঠে কমিশনের সমক্ষে একথা বলিয়াছিলেন।

সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা।

সৈয়দ আহম্মদ সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন সাধারণ সভ্য মনোনীত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উর্দ্দু ভাষায় "আসর-ই সনদিদ" নামে একখানি মোগলরাজগণ-সম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লেখেন। সেই পুস্তকখানি আজিও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। দিল্লীর তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গ্রন্থের একখানি লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীতে উপহার দেন এবং সেই পুস্তকখানির একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এম্, গ্যারেন ডি ট্যাসি নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত "Archæological History of the Ruins of Delhi" নাম দিয়া সেই পুস্তক ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। বস্তুতঃ দিল্লীর নিঁখুত ইতিহাস যিনিই লিখিতে চান তাঁহাকেই এই সৈয়দ আহম্মদের পুস্তক পড়িতেই হইবে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে উর্দ্দু ভাষায় একখানি পুস্তিকা লেখেন। সেই পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে এত মূল্যবান্ জিনিস ছিল যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তাৎকালিক ছোটলাট স্যর অক্‌ল্যাণ্ড্ কেলভিন 'Causes of the Indian Revolt' নাম দিয়া সেখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন। সিপাহী

বিদ্রোহের সম্বন্ধে দেশীয় লোকের উপর ইংরাজদিগের যে বিরুদ্ধ ধারণা হইয়াছিল, সৈয়দ আহম্মদ সর্ব্বপ্রথমে সেই ধারণা দূর করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"As regards the rebellion of 1857 the fact is, that for a long period, many grievances had been rankling in the hearts of the people. In course of time, a vast store of explosive material had been collected. It wanted but the application of a match to light it, and that match was applied by the mutinous Army. The original cause of the outbreak was the non admission of a native as a member into the Legislative Council. I believe that this rebellion owes its origin to one great cause to which all others are but secondary branches so to speak of the parent stem. I donot found my belief on any speculative grounds or any favourite theory of my own. For centuries many able and thoughtful men concurred in the views I am about to express. Most men, I believe, agree in thinking that it is highly conducive to the welfare and prosperity of Government ; indeed it is essential to its stability that the people should have a voice in its Councils. It is from the voice of the people only that Government can learn whether its projects are likely to be well-received . The voice of the people can alone check errors in the bud, and warn us of the dangers before they burst upon and destroy us."

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ "ভারতের রাজভক্ত মুসলমান" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কতিপয় মুসলমান রাজার সাহায্যার্থে কি কি কার্য্য করিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আর একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলন। সেখানির নাম "বিজনৌরে সিপাহী বিদ্রোহ"। সৈয়দ আহম্মদ যখন গাজীপুরে অবস্থান করিতে-ছিলেন তখন তিনি বাইবেলের টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইংরাজী ভালরূপ জানিতেন না বলিয়া উর্দ্দু ভাষাতেই ইহার সূত্রপাত করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সৈয়দ আহম্মদ ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখেন। সেই পুস্তিকাখানি "Strictures upon the present Government of India" নাম দিয়া ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধীয় তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মিঃ মামুদ সেই প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি অনেক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত ও ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজনৌরে অবস্থানকালে তিনি "আইন-ই-আকবরী" নামক অমূল্য গ্রন্থের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন। "আইন-ই-আকবরী" আবুল ফজল-কৃত অমূল্য ইতিহাস। এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদকালে মিঃ ব্লকম্যান সৈয়দ আহম্মদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া-ছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম হাণ্টার "The Indian Musalmans—are they found in conscience to rebel against the Queen?" নাম দিয়া একখানি পুস্তিকা লেখেন। সৈয়দ আহাম্মদ তৎক্ষণাৎ একখানা পুস্তিকা লিখিয়া হাণ্টারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং ভারতীয় মুসলমান যে রাজদ্রোহী নয় তাহা সপ্রমাণ করেন।

সৈয়দ আহম্মদ উর্দ্দু ভাষার বিস্তৃতি, উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব দেখিয়া একটি "উর্দ্দু অনুবাদ সমিতি" গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তিনি গাজীপুরে "অনুবাদ-সমিতি" স্থাপন করেন। পরে তাহা আলিগড়ে স্থানান্তরিত হয় এবং তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "বিজ্ঞান-সমিতি" রাখা হয়। এই সমিতি অনেকগুলি মূল্যবান ইংরাজী গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। তদানীন্তন ভারত-সচিব মহামান্য ডিউক অব আর্গাইল এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গের ও পঞ্জাবের ছোটলাট ইহার সহকারী সভাপতি হয়েন। শুধু যে পাতিয়ালার মহারাজ বাহাদুর এই সমিতিকে সাহায্য করিতেন তাহা নহে, অনেক হিন্দুও এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

সাধারণ-হিতকর কার্য্যে যোগদান

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টাতেই British Indian Association স্থাপিত হয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ দ্বিতীয় পুত্র মামুদকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। মামুদ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ষ্টেট্ স্কলারসিপ পাইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি বহুদিবস যাবৎ লণ্ডনের British Museum ও Oriental Libraryতে তৎপ্রণীত মহম্মদের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ব্রিটীশ ও স্কটীশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তথায় সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি "তাজিবুল আখলাক্" নামক একখানি মুসলমান সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় মাসিক

পত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহার সম্পাদকতা করেন। শীঘ্রই এই কাগজখানি সমগ্র মুসলমান-ভারতে আদৃত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ উত্তর পশ্চিম প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আইন-সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড লিটন কর্ত্তৃক বড়লাটের আইন-সভার অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ পুনরায় তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করেন। ভারতবাসীদের মধ্য তিনিই আইন সভায় প্রাইভেট বিল পেশ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তিনি দুইটি বিল আইন সভায় পেশ করিয়াছিলেন, প্রথমটি বাধ্যতা-মূলক টীকা দেওয়া (Compulsory Vaccination Bill), দ্বিতীয়টী কাজার বিল। বলা বাহুল্য, পঞ্জাবের ছোটলাট প্রথমোক্ত বিলটীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও সৈয়দের অসাধারণ বাগ্মিতা ও যুক্তি-তর্কের ফলে বিলটী পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহার দ্বিতীয় বিলটীও আইনে পরিণত হইয়াছিল।

আইন সভায় সৈয়দ আহম্মদ

স্যর সৈয়দ আহম্মদ ইলবার্ট বিলের সমর্থনকল্পে সুপ্রীম্ লেজিস্-লেটিভ কৌনসীলে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, স্যর সৈয়দ ও রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি-আই-ই—এই দুইজন মাত্র বে-সরকারী সভ্য এই বিল সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি সৈয়দ আহম্মদকে একটি স্বর্ণ পদক ও এক সেট মেকলের গ্রন্থ উপহার দেন। স্বর্ণ পদকটীতে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত ছিল :—

উপাধি ও সম্মান লাভ

"Presented by the Viceroy of India in public Durbar to Syed Ahmed, a loyal and valuable servant of the Queen, in recognition of his continuous and successful efforts to spread the light of literature

and science among his countrymen.” লর্ড লরেন্‌স স্বহস্তে মেকলের গ্রন্থের উপরে লিখিয়াছিলেন :—“To Moulavi Syed Ahmed Bahadoor, principal Sudder Ameen of Allyghur in recognition of his conspicuous services in the diffusion of knowledge and general enlightenment among his countrymen.”

লণ্ডনে অবস্থানকালে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লেভিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই লেভিতে সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে স্বরচিত দুইখানি পুস্তক স্বহস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ভারত-সচিব ডিউক্ অব আর্গাইল তাঁহাকে Companion of the Star of India উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ Knight Commander of the Star of India এই মহাসম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন।

শিক্ষা-সংস্কারক

শিক্ষা-সংস্কারক বলিয়াই শুর সৈয়দ আহম্মদ ভারত-বিখ্যাত। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি যে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বস্তুতই দুর্লভ। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি মোরাদাবাদে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল পরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড স্কুলে পরিণত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গাজীপুরে একটি স্কুল স্থাপন করেন, উহা বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া স্কুল নামে পরিচিত।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তিনি নবাব আব্দুল লতিফ খাঁ বাহাদুর কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কলিকাতার এক বিরাট সভায় পারশী ভাষায় এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Mahomedan Educational

Conferenceএর প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি প্রতি বৎসর ভারতে বিভিন্ন স্থানে এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া থাকে।

কিন্তু আলিগড়ের এংলো-ওরিয়েণ্টেল কলেজই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে এই কলেজটী সামান্য ভাবে স্থাপিত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে এই আলিগড় কলেজটীর উদ্বোধন হয়। স্যর সৈয়দ আহম্মদ এই কলেজের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারকল্পে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আলিগড়েই অবস্থান করিতে থাকেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী লর্ড লিটন বর্ত্তমান কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমতঃ কলেজে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করান হইত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এফ্‌-এ ক্লাস খোলা হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বি-এ ও এম-এ ক্লাস খোলা হইলে উহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত (affiliated) হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যর সালার জঙ্গ এই কলেজ পরিদর্শন করেন। ভারতে যে কোন বড়লাট আসিয়াছেন তিনিই এই কলেজ পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে আলিগড় কলেজের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে বলেন—

"Your College is only 33 years old, little more than the recognised life of a generation, yet in those few years, I think, I may say without exaggeration it has established itself as the centre and directing influence of educated Mahomedan thought in India. It has nobly fulfilled the hopes of its great founder and we may justly marvel at the commanding position it now holds, when we remember what Sir Syed Ahmed had to fare

at the commencement of his great work, not only financial difficulties which were plentiful enough, but something much harder to cope with, the weight of social and religious suspicions, the unthinking opposition of traditional customs and he triumphed over them."

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্তর সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় কলেজের জন্ম অর্থ-সংগ্রহার্থে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি তথাকার যেস্থানেই গমন করিয়াছিলেন, সেস্থানেই লোকেরা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও স্তর সৈয়দ

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্তর সৈয়দ বলেন—"আমরা হিন্দু ও মুসলমান অবশ্য এক-প্রাণ এক-আত্মা হইবার চেষ্টা করিব। যদি আমরা একত্র মিলিত হই, আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিব। যদি মিলিত না হই, তাহা হইলে উভয়েরই পতন অনিবার্য্য। পুরাতন ইতিহাস ও জনশ্রুতিতে অনেকেই অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন যে, যাহারাই পূর্ব্বে এক দেশে বাস করিত তাহারাই একজাতি বলিয়া অভিহিত হইত। আফগানিস্থানের বিভিন্ন অধিবাসী, ইউরোপের নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা সকলেই একজাতি বলিয়া অভিহিত। অতএব হিন্দু ও মুসলমান! তোমরা কি হিন্দুস্থান ছাড়া অন্য কোন দেশকে তোমাদের জন্মভূমি বলিতে পার? তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? তোমাদের মৃতদেহ কি একই মাটীতে সমাহিত ও ভস্মীভূত হয় না? তোমরা কি একই মাটীর উপর দিয়া চল না এবং একই মাটীর উপর বাস কর না? মনে রাখিও, হিন্দু ও মুসলমান শব্দ দুইটী কেবল ধর্ম্মের পার্থক্য দেখাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মূলতঃ কিন্তু

ইহারা একজাতি। এই উভয় জাতি তাহাদের দেশের মঙ্গলের জন্য অবশ্যই একযোগে কার্য্য করিবে।”

স্যর সৈয়দ আহম্মদ ভারতীয় জাতীয় মহাসভার আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। এই কারণেই তিনি ভারতীয় জাতীয় দলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার অসংখ্য লোকহিতকর কার্য্য ত উড়িয়া যাইবার নহে।

মৃত্যু

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ একাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার চরিত্রবল, সাহিত্য-প্রতিভা, মুসলমানগণের উপর একাধিপত্য প্রভৃতির জন্য এক সময়ে তাঁহার নাম প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় ছিল। তিনি তাঁহার দেশহিতৈষিণা, মনীষা, সার্ব্বজনীন প্রেমের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান-ভারতের ইতিহাসে স্যর সৈয়দ আহম্মদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবেন। আলিগড় কলেজের মস্‌জিদে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল গ্রেহাম তাঁহার জীবনীর একস্থলে লিখিয়াছেন—“He is of middle height and of massive build, weighing upwards of nineteen stone. His face is leonine—a rugged witness to his determination and energy. If, however, rather stern and forbidding when at rest, it lights up generally when speaking, reflecting the warmth of heart which he so largely possesses. He has a hearty laugh, and enjoys a joke as much as any man. He will put his stick under the table of dinner and suddenly frighten those present by pretending to see a snake. Or, again, the

subject of conversation is the reform of his nation. One of his listeners is sleepy and nods. The Syed is anxious that all should attend. The sleepy member says he hears everything. But he presently nods again. All of a sudden a terrific shout of alarm is heard which makes every one jump, including the sleepy one. But all they see is the old Syed in roars of laughter."

স্যার ফ্র্যানিসস্ ম্যাকৃলীন—বঙ্গের প্রধান বিচারপতি তাঁহার সম্বন্ধে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন উপলক্ষে ভাইস্-চ্যান্সেলরস্বরূপে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন :—

"Death has robbed of Sir Syed Ahmed K. C. S. I., L. L. D. who was appointed a member of our Senate in 1876. A member of the Governor-General's Council, his sterling work as a pioneer in the path of education may worthily attract our attention. Under his auspices, the Mahomeden Anglo-Oriental College at Aligrah was founded, a college which places a liberal education within the reach of Moslem community, and which has proved successful in reconciling the Mahomedan student to a consideration of western science and literature. The system in vogue at that College, whereby the students are in residence, under the immediate control and direction of teachers, also in residence, with large play-grounds at their disposal, might be usefully followed in other educational establishments in this country.

মজ্‌রল হক

আধুনিক ভারতের অন্যতম বিখ্যাত দেশহিতৈষী মৌলবী মজরল হক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় খালিফের বংশধর বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার পিতামহ সাখেয়াৎ আলি খাঁ একজন ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। তিনি বেহারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে প্রভূত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সময়ে আপন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কাজী রমজান আলি বিহারের একজন প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি সারণ জেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যখন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা ছাপরা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেসন্স জজের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বিপদরাশি দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সারণ জেলার একজন শ্রেষ্ঠ নীল-ব্যবসায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তেরটী নীলের কারখানা রাখিয়া যান। মাতামহ-কুলের দিক হইতে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মজরল হক একজন বিশুদ্ধ সৈয়দ, তাঁহার মাতামহ হাকিম সৈয়দ হামিদ আলি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক চিলেন।

পূর্ব্ব পরিচয়

পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে মজরলের শিক্ষা আরম্ভ হয়। দশম বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি হিন্দুস্থানী ও পারশ্য ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আরব্য ও ইংরাজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। একজন শ্রমশীল বালক ছিলেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাতৃভাষায় প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ

শিক্ষারম্ভ

করেন। সেই বৎসরেই তিনি পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা সম্মত হন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া কোন মতেই অনুমতি দিলেন না। ইহাতে হতাশ্বাস ও নিরাশ হইয়া তিনি পাঠে অমনোযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে যাইয়া তত্রত্য ক্যানিং কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কবিতা লিখিতে ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থান পরিদর্শন করিবার পর তিনি অভিভাবকগণের বিনানুমতিতে ইংলণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প করেন। ঐ বৎসর মে মাসে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

বোম্বাই হইতে মাত্র ৭০৲ টাকা পাথেয় সম্বল লইয়া তিনি যাত্রা করেন। যে জাহাজে তিনি যান সেখানি একখানি তীর্থযাত্রী জাহাজ।

ইংলণ্ডে গমন

এডেনে পৌঁছিয়া তিনি বাটী হইতে টাকা পাইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। নানা লোকে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু সমস্ত পীড়াপীড়ি ব্যর্থ হয়। এডেনে তিনমাস যাবৎ টাকার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার পর অবশেষে তিনি টাকা পাইলেন এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার আজীবনের বন্ধু মিঃ (এক্ষণে স্যর) সৈয়দ আলি ইমাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি কেবল আইনের গ্রন্থ-অধ্যয়নেই যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা নহে, অন্যান্য সাহিত্যও তিনি প্রভূত পরিমাণে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া আগষ্ট মাসে তিনি হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী না করিয়া তিনি বাঁকীপুরেই ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন।

ব্যারিষ্টারী ও মুন্সেফী

তিনি ব্যারিষ্টারীতে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করিতে লাগিলেও অকস্মাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিঃ (পরে স্যর) উইলিয়ম বার্কিটের অনুরোধে মুন্সেফী-পদ গ্রহণ করেন। ইহা দেখিয়া, তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একেবারে অবাক্ হইয়া যান। তিনি মুন্সেফী-কার্য্যে এতদূর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন যে, ছয়মাস যাইতে না না যাইতে তাঁহাকে স্থায়ীভাবে মুন্সেফ-পদে নিযুক্ত করা হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে নিম্ন আদালতের বিচারকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু সাহিত্যালোচনায় তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকায় তিনি অবসর-সময় গ্রন্থাদি-পাঠে অতিবাহিত করিতেন। এজন্য মুন্সেফী-কার্য্য তাঁহার নিকট বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইত। মুন্সেফী কার্য্য অপেক্ষা আরও বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল ; তাই তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সেফী-কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ছাপরার জেলা-আদালতে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। আপন ব্যবসায়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত মনোনিবেশ করায় তিনি শীঘ্রই ব্যারিষ্টারীতে বেশ নাম করিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য মোকদ্দমার ব্রিফ আসিতে লাগিল এবং তাঁহার যুক্তিতর্কে বিচারক একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ছাপরা পরিত্যাগ করিয়া বাঁকীপুরে আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এখানে আসিয়াও তিনি আইনজ্ঞ বলিয়া শীঘ্রই খ্যাতিলাভ করেন। অবিলম্বে তিনি পাটনা হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া গণ্য হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কানপুরের মসজিদ-সংক্রান্ত মোকদ্দমার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই মকদ্দমা-পরিচালন-ব্যাপারে মজহরুল এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন যে, স্বয়ং তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বিনা সর্ত্তে আসামীগণকে মুক্তি প্রদান করেন।

বাল্যাবধি মজরল হকের দেশহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। লণ্ডনে যখন তিনি আইনের ছাত্র তখন তিনি তথায় আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভা কালক্রমে লণ্ডনের বিখ্যাত "পান-ইস্‌লামিক সোসাইটী" নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন ততদিন তিনি এই সমিতির সেক্রেটারী ও পরে ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই রাজনীতিতে বিশেষতঃ ভারতীয় মহাসমিতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন।

দেশহিতৈষিতা

১০৯৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ছাপরায় ছিলেন, সেই সময় তিনি দুর্ভিক্ষ-নিবারণকল্পে বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় যাবতীয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি এরূপ কায়িক পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রায় এক বৎসরকাল রোগে ভুগিয়াছিলেন। পর বৎসর সহরের মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিবার জন্য তাহার সভ্যপদপ্রার্থী হন। তিনি বিনা আপত্তিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পর বৎসর তিনি মিউনিসিপালিটির ভাইস্‌-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন, এবং তিনি আর্থিক ব্যবস্থার এতাদৃশ উন্নতিসাধন করেন যে, তিনি বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী মিউনিসিপ্যাল বাজার স্থাপিত করেন। তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবার পর তিনি ব্যারিষ্টারী কার্য্যের ক্ষতি হয় বলিয়া উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা নগরীতে নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি সেই লীগ-প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তদবধি তিনি এই লীগের সাফল্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং জাতীয় মহাসমিতির আদর্শে যাহাতে লীগের কার্য্য পরিচালিত হয়

মুসলমান লীগ

তজ্জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রাদেশিক মুসলমান লীগের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের তিনিই প্রধানতম উদ্যোগী ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গয়াতে যে বিহার প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয় তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। সেই কন্ফারেন্সের সভাপতিস্বরূপে তিনি বলেন, "আমি যেন এ কথা কখনও না ভুলি যে, ধর্ম্মে আমি মুসলমান, ভারতীয় কার্য্যে আমি ভারতবাসী এবং প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি বিহারী। যদি আমরা সাহসের সহিত কার্য্য করিয়া যাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা বিজয়ী হইব। প্রথমতঃ আমরা অবশ্য আমাদের রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিব। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য আমরা অবশ্য গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিব। আমরা আপনা-আপনির মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহানুভূতি করিব। হিন্দু ও মুসলমান, পার্শী ও শিখ, জৈন ও খৃষ্টান পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে। আমাদের সম্মুখে যে কার্য্য তাহা অতি প্রশস্ত, আমাদের সম্মুখে যে কর্ত্তব্য তাহা অতি দায়িত্বপূর্ণ; এ সময় নিষ্ফল তর্ক-বিতর্কের সময় নহে। পরস্পরের মিলনের মধ্যেই আমাদের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত শুভক্ষণে আমাদের সংযোগ ও সংস্পর্শ হইয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা যদি গ্রেট ব্রিটেনের নিকট হইতে যাহা কিছু শিখিবার ও গ্রহণ করিবার আছে তাহা না শিখি, তবে দোষ আমাদেরই—আমাদিগকে এজন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। আমাদের সকলের এক চিন্তা, এক লক্ষ্য থাকা চাই। সেই চিন্তা হইতেছে—জননী জন্মভূমির উন্নতি-সাধন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মজরল্ হক্ তদানীন্তন "মডার্ণ বিহার" নামক মাসিক পত্রে "হিন্দুমুসলমান-সমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "এই দুই জাতি একত্র সম্মিলিত না হইলে ভারতের উন্নতি কখনই হইবে না।" তাঁহার

'মডার্ণ বিহার'

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বলেন, "যখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল তখন তাঁহারা অতি অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেহই স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আসেন নাই। কাজেই তাঁহারা হিন্দু রমণীগণকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অতি অল্প মুসলমান আছেন যাঁহাদের দেহে হিন্দুশোণিত প্রবাহিত না হইতেছে। মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে তাহাদের বাড়ীঘরের ন্যায় করিয়াছে, তাহারা উড্ডীয়মান পক্ষীর মত এদেশের ধন-রত্ন ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় নাই।"

১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নূতন কৌন্সিল য়্যাক্ট পাশ হইলে মজরল হক্ বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায়

অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া সকলের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে "অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা" সম্বন্ধে বলেন,—"ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। মাননীয় গোখলে মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা যুক্তি-তর্কের সহিত বলিয়াছেন। আমি তাঁহার বক্তৃতার পুনরুক্তি করিব না। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা মুসলমান সমাজ কতটা উপকৃত হইবে আমি তাহাই বলিতেছি। মুসলমান-ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুসলমান সমাজ শিক্ষার জন্য বিখ্যাত হইয়াছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমান সমাজ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপন আপন সম্পত্তির কিছু শিক্ষাদানের

নিমিত্ত প্রদান করা কর্ত্তব্য। বাগদাদ ও কাইরোর এবং গ্রানাডা ও কারডোভার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ কথার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। মুসলমানেরা বিজেতারূপে, পর্য্যটকরূপে অথবা বণিকরূপে যে দেশেই গিয়াছে সেই দেশেই একটা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ইউরোপে মুসলমানজাতি শিক্ষার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছিল। তাহাই আজ অত্যুজ্জ্বল আলোকে পরিণত হইয়া চারিদিক্ আলোকের বিভায় আলোকিত করিয়াছে। মোগল বাদশাহেরা নিজেরা এক একজন বিদ্বান্ ছিলেন : তাঁহারা বিদ্যালয় ও বিদ্বান্‌দিগকে জায়গীর ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তাঁহাদের সভাসদ্ ও অমাত্যগণও বাদশাহের অনুকরণ করিত। মোগলশাসনকালে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং আরও অনেক স্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল এবং ভারতের নানাদিক্ হইতে ছাত্রগণ এইসমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিত। প্রত্যেক গ্রামে মকতব ছিল। প্রত্যেক মানকা ও প্রত্যেক মসজিদে দরিদ্রদিগের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ছিল। রাজকোষ হইতে যে বিষয়েই দান করা হইত, তাহাতেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কিছু না কিছু টাকার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু এখন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এক সময় অতি উচ্চশিক্ষিত জাতি ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে অতি পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমরা যখনই ভারত সরকারের নিকট শাসন-বিষয়ে তুল্যাংশ পাইতে প্রার্থনা করি, তখনই সরকার বলেন যে, অগ্রে নিজেকে শিক্ষিত কর। আমরা সংখ্যায় আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের অপেক্ষা কম হইলেও যদি আমাদিগকে আমাদের ক্ষমতা-প্রকাশের অবসর দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা কাহারও অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহি। আমাদের অধঃপতনের জন্য আমরাই দায়ী। সরকার ভারতের প্রত্যেক লোককে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শিক্ষালাভ করিবার অবকাশ দিয়াছেন, কিন্তু

আমরাই এতদিন সে স্বর্ণ সুযোগকে উপেক্ষা করিয়াছি। তাহার ফলে অন্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষা-বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের অধঃপতনের আর একটি কারণ আমাদের দারিদ্র্য। মুসলমানেরা যে দরিদ্র এ কথা প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়াছে। আধুনিক ভারতে অবশ্য দুই চারিজন মনীষাসম্পন্ন মুসলমান নায়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মুসলমান শিক্ষার প্রধান অগ্রণী স্যর সৈয়দ আহম্মদের নাম কে বিস্মৃত হইয়াছেন? মহামান্য আগা খাঁয়ের বিদ্যাবত্তার বিষয়ও সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু মুসলমান ভারতের ইতিহাসে এইরূপ দুই চারিজন শিক্ষিত মুসলমানের নাম পর্য্যাপ্ত নহে। মাননীয় গোখলের এই প্রস্তাব যদি ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করেন এবং এই প্রস্তাবানুযায়ী যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা আর পশ্চাৎপদ জাতি থাকিব না। ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করায় মুসলমান সমাজ মাননীয় গোখলের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তাব পাশ হইলে ভারতের মধ্যে মুসলমান সমাজই বিশেষ উপকৃত হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মুসলমানদের সম্মান ও মর্য্যাদা অন্য জাতিসমূহের সমতুল্য হইবে। আমি অর্থসচিব মহাশয়ের অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। সেদিন তাঁহাকে সরকারের ব্যয়ভারনির্ব্বাহের জন্য নূতন কর বসাইতে হইয়াছে। অর্থসচিব মহাশয় হয় ত বলিবেন যে, ভারত-গভর্ণমেণ্টের এখন অর্থাভাব। অর্থসচিব মহাশয়ের উত্তর যে নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার মত একজন অর্থনীতিবিদ্‌কে এইরূপ একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উপায়-উদ্ভাবনে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। যদি কেহ অন্যায় বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে, আগামী বৎসরের জন্য বাজেটে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, সেই টাকাটা এই প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যাপারে খরচ করা হউক। আমার বিশ্বাস, ইহাতেই মাননীয়

গোখলে ও আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এই আশাতে সরকারের নিকট তাঁহাদের দেশের দুঃখ-দুরবস্থা জ্ঞাপন করেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বে-সরকারী সভ্যদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেও পারেন, আবার না-মঞ্জুরও করিতে পারেন। আমি নিবেদন করিতেছি, সরকার যেন সর্ব্ববাদিসম্মত একটি আবশ্যক দাবীকে তাচ্ছিল্য না করেন। সমগ্র ভারতবাসী আজ নিরক্ষর জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে, এ সময় সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য, একটি সুন্দর ও সুপ্রণালীসম্মত উপায় প্রদর্শন করা। ভারতের কৃষকেরা অতি মূর্খ। ভারতের ইতর-জনসাধারণ যেরূপ অজ্ঞতার আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, পৃথিবীর কোন জাতি সেরূপ নয়। ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ আধুনিক বিজ্ঞানের কথা শুনে নাই। তাহারা যদি একটু শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দিনে অনেক উন্নতি ও উপকার লাভ করিতে পারে। তাহারা একটু শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে তাহাদের বাড়ী-ঘর মানুষের বাসোপযোগী করিতে পারে; তাহারা একটু শিক্ষা করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি অধ্যয়ন করিয়া সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাহারা একটু শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের জমির উর্ব্বরতা-শক্তি আরও বৃদ্ধি করিতে পারে এবং গম ধান্য কলাই আদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে। শিল্পীরা একটু শিক্ষিত হইলে তাহারা হাতে গড়া শিল্প ও কারুকার্য্যসমূহের আরও উন্নতি করিতে পারে; দুর্ভিক্ষ অন্নাভাবের সময় তাহারা তাহা হইলে আর অন্নাভাবে মারা যাইবে না। এরূপ একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের পরীক্ষা অচিরাৎ হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা পুনরায় দ্বিগুণ আকারে সরকারের তহবিলে আসিবে, কারণ দেশের

জনসাধারণ লেখাপড়া শিখিলে দেশও উন্নত এবং সমৃদ্ধ হইবে এবং সরকারের আয়ও বাড়িবে। মাননীয় গোখলে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে তাহাদের অধিকার দিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর যে কোন মহত্তর কার্য্য আছে, সেরূপ বলিয়া ত আমার বোধ হইতেছে না।”

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ মজরল হক্ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পুনরায় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। রাউলাট য়্যাক্ট পাশ হইলে তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসর বাঁকীপুরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার সাক্ষ্যপ্রদান সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবল ‘বেঙ্গলী’ সে সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

“The evidence of Mr. Mazar-ul-haque is decidedly among the best yet recorded by the Public Service Commission. His frank and outspoken criticism of the present system is all the more refreshing because it comes from an eminent representative of the great community who have been among its greatest victims.”

মজরল হকের সহিত ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সংস্পর্শ অনেক দিন হইতে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, “আমি কংগ্রেসের সেবার জন্য সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছি।” ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সপ্তবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া ‘বেঙ্গলী’

কংগ্রেসের সেবায়

বলেন—"মিঃ মজরল হক যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার বক্তৃতার প্রতি বাক্যে স্বদেশের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকটিত হইয়াছে।"

বিহারের প্রতিনিধিকে আহ্বান করিয়া মিঃ মজরল হক সেই মহা-সমিতিতে বলেন—"আপনারা আজ যে স্থানে সমবেত হইয়াছেন, সেই স্থান ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান। এই নগরেরই প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র, এই পাটলীপুত্রেই মহারাজ অশোকের প্রাসাদ ও অট্টালিকা-সমূহ দণ্ডায়মান ছিল। এই স্থানের সমকক্ষ অন্য কোন নগর ভারতবর্ষে নাই। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মগধ, অঙ্গ এবং বৈশালী আধুনিক পাটনা, ভাগলপুর ও ত্রিহুত জেলা। তাহার পর বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। মহারাজ বিম্বিসার এই মগধরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু এই মগধ রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং পাটলি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ের রাজত্বকালে এই পাটলিদুর্গের নাম পাটলিপুত্র হয়। এই পাটলিপুত্রে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই পাটলিপুত্র হইতেই জগদ্বিখ্যাত অশোকলিপি প্রথম প্রচারিত হইয়া-ছিল। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর ত্রিহুত জেলার বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাটনার অন্তর্গত পাওয়াতে দেহত্যাগ করেন। এখান হইতে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ গয়াতে বুদ্ধদেব সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রচার করিয়াছিলেন। এখান হইতে অল্প দূরে রাজগৃহ পাহাড়ের উত্তরদিকে আধুনিক বারাগাঁও গ্রামে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। সেখানে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং দশ সহস্রাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকে শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র শিশুঙ্গ, নন্দ, মৌর্য্য, সুঙ্গ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

সম্রাট্ অশোকের সময় এই পাটলিপুত্র উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। মহারাজ অশোকের রাজ্য যে শুধু ভারতেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, সুদূর আফগানিস্থান পর্য্যন্ত দেশ তাঁহার রাজ্যাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক—এই তিনজন বিহারী সম্রাট্ সমগ্র ভারত জ্ঞান ও দয়া দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া চিরদিন বিহার-বাসীর নিকট গৌরবস্তম্ভস্বরূপ প্রতীত হইবেন। এই তিনজন মৌর্য্য সম্রাট্ যে কেবল যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহারা সুসংস্কৃত ও সুপ্রণালী-সম্মত শাসন-পরিচালনে সক্ষম ছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে ভারতবর্ষ যে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা তদানীন্তন সময়ের ইতিবৃত্ত পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তাঁহাদের সময়ে মিউনিসিপালিটীর অবস্থা, দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। তাঁহাদের পর হইতে সের শাহের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তীকালে পাটনার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা, যায় না। সের শাহ এই নগরীর পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন এবং মোগল-শাসনকালে ইহা প্রাদেশিক গবর্ণরের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবের পৌত্র যুবরাজ আজিমুসান এই নগরের উন্নতি সাধন করিয়া ইহার নাম "আজিমাবাদ" রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ভারতীয় মুসলমানদের নিকট এখনও পাটনা এই আজিমাবাদ নামেই পরিচিত। মোগল-শাসনকালে এই নগরী ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান স্থান ও জনাকীর্ণ সহরে পরিণত হইয়াছিল। ব্রিটীশ শাসনকালেও এই নগরী নিশ্চয়ই ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহর বলিয়া গণ্য হইত, যদি ভারত-সম্রাট্ দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর-করণের আদেশ না দিতেন।"

কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন—"আমার স্বজাতীয়গণ! তোমরা তোমাদের মাতৃভূমিকে

ভুলিও না। সকল সন্তানের উপরই ভারতমাতার দাবী আছে, যদি তোমরা মায়ের আহ্বানে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে তোমরা পাপগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদিগকে জন্মভূমির পবিত্র নামে জাতীয় মহাসম্মিলনীতে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। কোন কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস হিন্দুদিগের দ্বারা গঠিত। আমি একথা একেবারে অস্বীকার করিতেছি। মুসলমানেরা অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসে তাঁহাদের ন্যায্য কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করেন না বলিয়াই হিন্দু ভ্রাতৃগণ এই জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য বরাবরই জাতীয় ভাবাপন্ন—সাম্প্রদায়িক নহে। যদি কোন মুসলমান ভ্রাতার কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে, তবে তিনি এখানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, একবার তাঁহারা কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসিলে আর ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ইহা জাতীয় প্রতিনিধির সঙ্ঘ। যদি অধিক সংখ্যায় মুসলমান কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবে আপত্তি করে, কংগ্রেস কখনও সে প্রস্তাব অবহেলা করিতে পারেন না। আমি আশা করি, আমার নিবেদনে সকলেই কর্ণপাত করিবেন। আমার জীবনের উদ্দেশ্যই—হিন্দু মুসলমান দুই ভাইকে একত্রিত করা।"

পুনরায় ইংলণ্ডে গমন

/১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ মৌলবী মজরুল হক ইংলণ্ডে গমন করেন।/ তিনি তথায় ৩০শে মে তারিখে ডাক্তার ডি-এন্ মেটার সভাপতিত্বে ক্যাক্টন হলে যে সভা হয় সেই সভায় 'ভারতের জাতীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

/১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে নিখিল ভারতীয় মোসলেম লীগের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি ভারতের সন্তানমণ্ডলী মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সত্য সত্যই ইচ্ছা করে, তাহা হইলে

তাহাদিগকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একই উদ্দেশ্যে একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের মোসলেম লীগ হিন্দুসভা আছে। সেখানে পরস্পরে স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিতে পারেন। তারপর আমাদের কংগ্রেস আছে, তাহাও হিন্দুমুসলমানের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত। বড়লাট অথবা ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভা-সমূহেও আমরা সরকারের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে পারি। পরিশেষে আমি আমার দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের ভেদাভেদ ভুলিয়া যাউন এবং মাতৃভূমির জন্য ভাই ভাই একত্র হইয়া কার্য্য করিতে থাকুন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগনীতি প্রচলিত হইবার পর মজরল্ হক্ তাহাতে যোগদান করিয়া খেলাফতের জন্য আপন প্রাসাদতুল্য বাটী, জমিদারী, জায়গা, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং নিজে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ফকারের ন্যায় দিনযাপন করিয়া নীরবে দেশের সেবা করিতেছেন। তিনি গত ২রা ডিসেম্বর ১৯২৯ খৃঃ ছাপরা জেলায় ফরিদপুর পল্লীভবনে মারা গিয়াছেন। তিনি অনেকদিন যাবৎ পক্ষাঘাতরোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।

হাকিম হাফিজ মহম্মদ আজমল খাঁ

গত আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হাকিম আজমল খাঁর নাম আজ ভারত-বিখ্যাত। তিনি পাঠান-বংশীয়। তিনি কোন স্কুল বা কলেজে শিক্ষা লাভ করে নাই। বাটীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের নিকট তিনি প্রাচ্যশাস্ত্রসম্মত দেশীয় ভৈষজ্যমতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি এই চিকিৎসায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আসমুদ্র-হিমাচল-বিদিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হাকিম মহম্মদ। মহম্মদ খাঁর পূর্ব্ব-পুরুষ মহম্মদ কাসিম ও খাজা মহম্মদ হাসিম সম্রাট্‌ বাবরের সহিত মানগড় হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া হায়দ্রাবাদ সিন্ধুদেশে বাস করেন। তাঁহারা সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্রাট্‌ আকবরের রাজত্বকালে মোল্লা আলিকড়ি এবং মোল্লা আলিদাউদ আগ্রায় বা আকবরাবাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং আকবরের দরবারের খুব শিক্ষিত সভ্য ছিলেন। এই দুই মোল্লা কতিপয় প্রাচীন পুস্তকের আরব্য ভাষায় টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অদ্যাপি সুপণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন। মোল্লা দাউদের পুত্র হাকিম ফজল খাঁ সম্রাট্‌ আকবরের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনিই এই বংশের প্রথম চিকিৎসক। হাকিম মহম্মদ ওয়াজল খাঁ আওরেঙ্গজেবের দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—মহম্মদ অমল খাঁ ও মহম্মদ আকমল খাঁ পাটনা জেলায় বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর ও মাসিক ৩০০০৲ তিন সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন। আকমল খাঁয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ সেরিফ খাঁ

পাণিপথ ও শুণীপথ পরগণায় আটখানি গ্রামের জায়গীর লাভ করেন। এই জায়গীরের বাৎসরিক আয় ২৫০০০৲ হাজার টাকা। হাকিম সেরিফ খাঁর বার্দ্ধক্যদশায় ও শাহ্ আলমের রাজত্বকালে তাঁহার জায়গীর তাঁহার ছয় পুত্রের হস্তে হস্তান্তরিত হয়। সেই সনদে সম্রাট্ শাহ্ আলম স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত এই বংশের বংশধরগণের নিকট আছে। হাকিম সেরিফ খাঁয়ের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন এবং জায়গীরের পরিবর্ত্তে সেই ছয় পুত্রকে কিছু কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

হাকিম সেরিফ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাকিম সাদিক আলি খাঁ উপরোক্ত বৃত্তি ছাড়াও তিনখানি গ্রামের জায়গীরদার ছিলেন। হাকিম সাদিক আলি খাঁয়ের তিন পুত্র ছিলেন—গোলাম মহম্মদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ এবং মুরতাজা খাঁ। ইঁহারা তিনজনই এখন মৃত। হাকিম মহম্মদ খাঁয়ের তিন পুত্র—(১) হাজিক্ত-উল-মুলক হাজিক্ত মহম্মদ আবদুল মজিদ খাঁ (২) হাকিম মহম্মদ ওয়াশিন খাঁ, (৩) হাকিম মহম্মদ আজমল খাঁ। প্রথমোক্ত জন ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে "হাজিক্ত-উল-মুলক" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদর তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত হাকিম আবদুল মজিদ খাঁ ও হাকিম মহম্মদ ওয়াশীন খাঁ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। এখন এই সম্ভ্রান্ত বংশের একমাত্র উজ্জ্বল চন্দ্র—হাকিম মহম্মদ আজমল খাঁ। ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও স্বদেশহিতৈষিণাগুণে ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'হাজিক্ত-উল্-মুলক্" উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুমোদনে ভারত-সম্রাট তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর "কৈশর-ই হিন্দ্" স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

হাকিম আজমল খাঁ দেশের শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি আলিগড় মুসলমান কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং নিখিল ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সম্মিলনের (Conference) প্রতিনিধি নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানি সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি, নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগের ও মাদ্রাজ জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের সহকারী সভাপতি। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক দেশহিতকর সভা-সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে সংবদ্ধ।

বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ দিল্লীতে "আয়ুর্ব্বেদীয় ইউনানী টিবি কলেজ" নামে যে দেশীয় কলেজ আছে, হাকিম আজমল খাঁ তাহার স্থায়িত্বের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ দিল্লীর কেরলবাগ নামক স্থানে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখনও এই কলেজের গৃহ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এতদর্থে ব্যয়িত হইয়াছে। এই কলেজ-গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে। এই কলেজ-গৃহের সংশ্লিষ্ট "হিন্দুস্থানী দাওয়াখানা" নামে একটী দেশীয় ভৈষজ্যভাণ্ডার আছে। সেখানে দেশীয় অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভৈষজ্য ভাণ্ডার হাকিম আজমল খাঁয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

হাকিম আজমল খাঁ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন—

(১) আত-তাউন (প্লেগ সম্বন্ধীয় পুস্তক)

(২) আত-তুজাত-উ-হামেদিয়াফি সিনাইত-তাফলিসিয়া (কুষ্ঠ সম্বন্ধীয়)।

(৩) আল্-কোয়াল-উল-মার্ম্মব-ফিমা-উল-মক্রব।

(৪) অল-বায়ন-উল-হুসন-আস্-মাড়াউল-মর্জ্জন-উল-মুমান্না-ইকসির-উল-বদন।

(৫) আদাক-ই-মুঝিরা (অনেক ঔষধের সম্বন্ধে উত্তর)।

(৬) মুফা ডেমাতুল-লুমট (ইউনানী সম্বন্ধে নূতন পুস্তক)।

এই পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথমখানি ভিন্ন অন্য সমস্তই আরব্য ভাষায় লিখিত।

দিল্লীর বালিমারা নামক স্থানে সেরিফ মঞ্জিল নামক প্রাসাদে হাকিম আজমল খাঁ বাস করেন।

দিল্লীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেককালে তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করেন। এই দেশভ্রমণের পূর্ব্বে তিনি ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছিলেন।

পঞ্জাবের অনাচার দেখিয়া হাকিম আজমল খাঁ ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের উপর একান্ত আস্থাহীন হন। সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে তিনি ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে সরকার-প্রদত্ত সমস্ত উপাধি ও স্বর্ণপদক সরকারের নিকট ফিরাইয়া দেন। ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশনে আজমল খাঁ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি "স্বরাজ"-প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। এই অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তিনি অসহযোগব্রত গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে তিনি অসহযোগের সাফল্যকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, ভারতের অন্যতম প্রধান জননায়ক।

হাকিম আজমল খাঁ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। দিল্লীপ্রদেশে প্রধানত

তাঁহারই উদ্যোগে ও চেষ্টায় গোহত্যা অনেক হ্রাস পাইতেছে। এঙ্গোরা ফণ্ডে তাঁহারই চেষ্টায় প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকা উঠে এবং এঙ্গোরায় প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় মোপলা-সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তিনি উহাতে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

গত ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গ্রেপ্তার হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাকিম সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালন করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের মর্ম্ম প্রকাশিত হইল :—

সভাপতির অভিভাষণ

ভ্রাতা ও ভগিনী প্রতিনিধিগণ এবং উপস্থিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ! ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম অসাধারণ অবস্থায় পড়িয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে প্রচণ্ড চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। আজ আমাদের সভার কার্য্য চালাইবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আমাদের মধ্যে না থাকায় আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। বঙ্গের সেই স্বনামখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিক কত প্রকারে জাতীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা উল্লেখ করা অথবা আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি কি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র মনে করি। দেশের সকল লোক আজ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের পদ প্রদান করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য আমরা দুঃখিত হইলেও, দেশ আজ যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিয়া নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া-

ছিলেন, তিনি তাঁহার সাহস, স্বার্থত্যাগ ও হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখাইয়া স্বেচ্ছায় কারাগারে গমন করায় আমরা সকলে খুব আনন্দ অনুভব করিতেছি। কারণ তাঁহার গ্রেপ্তারে আমাদের সাফল্য নিকটতর হইয়াছে। আজ কংগ্রেসের সভাপতির কাজ করিয়া চিত্তরঞ্জন যে কাজ করিতেন, গ্রেপ্তার হইয়া তিনি আরও অনেক বেশী দেশের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তার জাতীয় কর্ম্মীদের অন্তরে অধিকতর শক্তি ও সাধনা প্রদান করিয়াছে এবং লোকজনকে মহত্তর কর্ম্মে ও স্বার্থত্যাগে অধিক প্রণোদিত করিয়াছে। শ্রীযুত দাশের স্থান পূর্ণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমাকে তাঁহার স্থানে এই বিশেষ সম্মানের পদে নির্ব্বাচিত করায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি শুধু যে এই মণ্ডপে এই পদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিব তাহা নহে, আমার ভ্রাতৃগণের মত যখন দেশের জন্য আমাকে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, তখনও আমি আপনাদের প্রদত্ত সম্মান বজায় রাখিতে ক্রুটি করিব না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের পর হইতে অসহযোগ আন্দোলন কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে অনেক সময় লাগিবে। অত্যাচার-বর্জ্জিত সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলনের ফলে দেশের কি লাভ হইয়াছে, আমি সেই কথাই সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিব। অসহযোগের শক্তি দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, দেশের কোন অংশে এমন কোন প্রকৃত ভারতবাসী নাই, যাহার হৃদয় স্বার্থত্যাগের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই। স্বরাজ-লাভের জন্য এবং খেলাফৎ ও পঞ্জাব-অনাচারের প্রতীকারের আশায় সকলে প্রফুল্ল। ভারত-সমুদ্রের পরপার হইতেও অন্য জাতিসমূহ ভারতকে আজ যে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে তাহা সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমাদের মিশরবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন

লইয়া আজ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের অহঙ্কারের কথা এই যে, আমরা আজ অন্য দেশকে পথ দেখাইয়া চলিতেছি। আজ অত্যাচার-বর্জ্জিত অসহযোগ আন্দোলন আর শুধু ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নাই। সমগ্র এসিয়ায় এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যখন জগতের সকল জাতিই সার্ব্বজনীন অনাচার ও অসত্য ধ্বংস করিবার জন্য এই অত্যাচার-বর্জ্জিত অসহযোগ আন্দোলন গ্রহণ করিবে। ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য এখন আর কে অস্বীকার করিবে? আমাদের যে কর্ম্মিগণ আনন্দের সহিত স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করিয়া কারাদণ্ড বরণ করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা দেখিয়া সকলের মনে কি হয়? এত চণ্ডনীতি ও অত্যাচার সত্ত্বেও কেহ অত্যাচার-বর্জ্জনের ভাব ছাড়েন নাই। ইহাতে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক দমননীতিতেই সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে দেশের লোকের অধ্যবসায় বাড়ে বৈ কমে নাই। ফতোয়া ও জামিয়াৎ উলেমা-সকল বাজেয়াপ্তি, রাজদ্রোহসূচক সভাবন্ধের আইন প্রয়োগ, করাচির বিচার, ফৌজদারী কার্য্য-সংশোধক আইন, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ, স্বেচ্ছাসেবকদলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা, সহরবাসীর জন্মগত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চনা প্রভৃতি চণ্ডনীতিই সুফল প্রদান করিয়াছে। মানুষের জন্মগত অধিকারে তাহাদিগকে বঞ্চিত করায় ভারতের উত্তর প্রদেশের এবং মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র দেশের অধিবাসিবৃন্দ দলে দলে যাইয়া স্বরাজ-আশ্রমের (জেলের) অতিথি হইতেছেন। জাতি আজ যে যুদ্ধে নিযুক্ত তিনি তাহার গুরুত্ব ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া সৎ উদ্দেশ্যে সাহসী যোদ্ধার মত স্থিরভাবে কাজ করিতেছেন। এই যুদ্ধের সময়ও আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় নাই। শুধু এসিয়া ও আফ্রিকাবাসিগণের বিবেচনা-

শক্তি যে আজ জাগিয়াছে তাহা নহে, য়ুরোপের শক্তি খুব ক্ষীণভাবে হইলেও ধীরে ধীরে জাগ্রত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

যুবরাজের আগমন সম্বন্ধে আমি একটি মাত্র কথা বলিব। যুবরাজের সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই। যুবরাজের আগমনের অছিলায় এই দেউলিয়া গবর্ণমেণ্টকে আমরা বড়লোক হইতে দিতে চাই না। তা ছাড়া যতদিন না খেলাফৎ ও পঞ্জাব-অনাচারের প্রতীকার হইয়া দেশ স্বরাজ লাভ করে, ততদিন কোন ভারতবাসী যুবরাজকে ভাল করিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না। সেই জন্য আমরা যুবরাজের আগমন-উৎসবে যোগদান করিতে বিরত হইয়াছি। এই জন্য যদি কোন খারাপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সে জন্য গবর্ণমেণ্টই সম্পূর্ণ দায়ী; কারণ তাঁহাদের বিবেচনা-শক্তির অভাবের জন্যই এই দুঃখজনক ঘটনা হইয়াছে।

সাফল্য-অসাফল্য

আমাদের প্রতিকূল সমালোচকেরা বলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের উক্তি সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, উপাধিধারী সম্প্রদায়, নূতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন হাইকোর্টগুলির ব্যবহারজীবীদের উল্লেখ করেন। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের উক্তি—অসহযোগের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি ঐ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। যে সকল ছাত্র স্কুল-কলেজ ছাড়িতেছে, তাহাদের জন্য আমরা যথেষ্টসংখ্যক ন্যাশন্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই; তথাপি এই অবস্থা। উপাধিধারী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কিরূপ তাহা দেখিলেই

অসহযোগের শক্তি বুঝা যাইবে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে প্রথমে দেশমাতৃকার আহ্বানে অগ্রসর না হওয়াই স্বাভাবিক। আর এই জন্য এখন তাঁহাদের সম্মান-মর্য্যাদা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে। জারের আমলের রুবল মুদ্রার অপেক্ষাও তাঁহাদের সম্মানের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্মান সৃষ্টি করিয়া বাজারে বাহির করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। জনসাধারণের মতের উপরই তাঁহাদের সম্মান-মর্য্যাদার মূল্য। ব্যবহারজীবীরা সকলে যথাযোগ্যভাবে দেশের কাজে অগ্রসর হন নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু আমরা পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্ত্তন যেমন অধিক অধিক করিতে থাকিব, ব্যবহারজীবীরাও তেমনি জনসাধারণের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিবেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা একটু স্বতন্ত্র, পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে ভাবে পদত্যাগ করিতে দেখা যাইতেছিল, গত মাসে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক পদত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই সেদিকে আমাদিগকে একেবারেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে না। সরকারের চণ্ডনীতির ফলেই এই পদত্যাগের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিতেছে বলিয়া তাহা আরও সুখের বিষয়।

মডারেট সম্প্রদায়

আমাদের অনেক মডারেট ভ্রাতা দেশমাতৃকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। আমরা যে সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছি, তাহার ধারা ও তাহার ফলাফল ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা এখনও দেশের কাজে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, তাঁহাদের হৃদয়ে এখনও স্বদেশপ্রেম জাগরিত রহিয়াছে এবং আমার বিশ্বাস, তাহা লুপ্ত হইবে না। শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং দেশমাতৃকার যজ্ঞে আত্মবলি দিবার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বগামী ভ্রাতাদের শূন্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

মোপলা-বিভ্রাট

প্রত্যহ মালাবারে যাহা ঘটিতেছে, আমাদের হতভাগ্য মোপলা ভ্রাতাদের সেই শোচনীয় ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া আমার কথার শেষ করিতে পারিতেছি না। এই মোপলা-সমস্যার দুইটা দিক আছে; প্রথম—সরকারের ব্যবহার, দ্বিতীয়—হিন্দু ভ্রাতাদের প্রতি মোপলাদের ব্যবহার। গবর্মেণ্টই মোপলাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন। আর এ গোলযোগ দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহার নিন্দা করিবেন। অমৃতসরের কাণ্ডে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন, এ উপায় কিরূপ ভীষণ। মোপলা-বিভ্রাটের একটী ঘটনা জনসাধারণের গোচরীভূত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? যে সব হিন্দু মোপলাদের হস্তে উৎপীড়িত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি; প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানই তাহা করিবে। বিরাট মোপলা-সমাজও নিশ্চয়ই এ সব কাজের নিন্দা করিয়া থাকেন।

নবীন ভারত

মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের দেশে এখন বিষম ওলট-পালট চলিয়াছে। ইহা নবীন ভারতের সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্ব সূচনা। অদূর ভবিষ্যতের সেই নবীন ভারত এই প্রাচীন দেশের অতীত ইতিহাসের যশোগৌরবে আবার মণ্ডিত হইবে—জগতের জাতিসমূহের মধ্যে ভারত আবার তাহার যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হাকিম আজমল

১৯২৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর হাকিমজী নূতন দিল্লীর নিকট রামপুরের নবাব-বাড়ীতে যান। রামপুরের নবাব হাকিমজীর পরম বন্ধু। সেখানে হঠাৎ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তিনি একজন ডাক্তার ও কিছু গরম জল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আসিয়া পৌছিবার

পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎক্ষণাৎ নবাব সাহেব নূতন দিল্লীতে হাকিমজীর পুত্রের নিকট তার করেন। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় মোটর-যোগে তাঁহার শবদেহ নূতন দিল্লীতে পাঠান হয়। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শবদেহের অনুগমন করে। তাঁহার বাটী হইতে শবাধার শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চাঁদনী চক্ হইয়া শোভাযাত্রা জুম্মামসজেদে পৌছে, এই মসজেদে তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর শোভাযাত্রা হিন্দু পল্লী চৌরীবাজার দিয়া যাইবার সময় বহু হিন্দু তাহাতে যোগদান করে। মোট প্রায় ৫।৬ হাজার লোক সেই শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান দোকান-সমূহ শোক-প্রকাশের চিহ্ন-স্বরূপ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। হাকিমজীর মৃতদেহ সৈয়দ হাসান রসুল লামায় সমাহিত করা হয়। এইখানেই তাঁহার বংশাবলীর সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

তখন মাদ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল। মাদ্রাজে এই সংবাদ পৌছিলে সকলে শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নেতৃগণ সাশ্রুনয়নে হাকিমজীর জন্য শোক প্রকাশ করেন।

তাঁহার এক পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্র হাকিম মহম্মদ জামিন খাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে একত্রিশ বৎসর মাত্র।

ভারতের এমন কোন স্থান নাই যেখানে হাকিমজীর জন্য শোক প্রকাশ না করা হইয়াছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের যোগসূত্র-স্বরূপ ছিলেন এবং যাহাতে হিন্দু-মুসলমানে মিলন হয়, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী একজন একনিষ্ঠ সুসন্তান হারাইয়াছে।

নবাব স্যর ফারিদুন মুল্ক বাহাদুর

কে-সি-আই-ই, জি-এস-আই, সি-বি-ই

ব্রিটিশ সরকারের অধীনে অথবা দেশীয় রাজ্যেই হউক এরূপ অতি অল্প লোক আছেন যাঁহারা নবাব স্যর ফারিদুন মুল্ক বাহাদুরের ন্যায় প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিপত্তির সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে হায়দ্রাবাদ সরকার তাঁহাকে শাসন-পরিষদের (Executive Council) আজীবন সভ্য নিযুক্ত করেন।

কিছুদিন যাবৎ নবাব স্যর ফারিদুন মুল্ক হায়দ্রাবাদ রাজ্যে একজন সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কি সামাজিক ভাবে আর কি রাজনৈতিক ভাবে তিনি রাজ্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ভারত সরকারও তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের যে কতটা হিতসাধন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট নিজাম বাহাদুর যে কতটা ঋণী তাহা Extraordinary Gazette-এ নিজাম বাহাদুরের লিখিত ফার্ম্মান দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। সেই ফার্ম্মানে মহামান্য নিজাম বাহাদুর নিজেই স্যর ফারিদুন মুল্ক বাহাদুরের যে প্রশংসা ও তাঁহার অবসর-গ্রহণে যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্যর ফারিদুনের প্রতি সত্যই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত কি ব্রিটিশ রাজ্যে, কি দেশীয় রাজ্যে কেহই কখনও পূর্ণমাত্রায় পেন্‌সন ভোগ করেন নাই, কিন্তু স্যর ফারিদুন আপন কর্ম্মকুশলতার জন্য এই পূর্ণ পেনসনের

অধিকারী হইয়াছেন। পঁয়ত্রিশবৎসরকাল একাদিক্রমে স্যর ফারিদুনজি রাজ্যের এত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রথম স্যর সালর জঙ্গ তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি ও চেন উপহার দিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদ-রাজ্যে জরীপ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে স্যর ফারিদুনজি অতি যোগ্যতার সহিত সেই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সালর জঙ্গ যখন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তখন স্যর ফারিদুনজি মহাশয় নিজাম বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পর পর পাঁচজন প্রধান মন্ত্রীর শাসনকালে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে অবস্থান করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে রাজনীতিবুদ্ধির এরূপ অসাধারণ পরিচয় দিয়াছিলেন যে, সকলেই একবাক্যে বলিত যে, তিনি যে কোন বৈদেশিক বড় রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দ্বিতীয় স্যর সালার, স্যর আসমানঝা, স্যর ভিকার-উল-উমরা, স্যর কৃষ্ণপ্রসাদ ও তৃতীয় স্যর সালার জঙ্গ এই ছয়জন প্রধান মন্ত্রীর শাসনকালে স্যর ফারিদুন মুল্‌ক অতি যোগ্যতার সহিত প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। অতঃপর যখন নিজাম বাহাদুর স্বহস্তে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন স্যর ফরিদুন মুল্‌ক নিজাম বাহাদুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ অতি যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯১৪ সালের ২রা ডিসেম্বর নবাব তৃতীয় সালার জঙ্গ অবসর গ্রহণ করিলে নিজাম বাহাদুর স্বরাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগী হন। পাঁচবৎসরকাল নানারূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর কিছুদিন হইল শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শাসনসংস্কার-প্রবর্ত্তনের জন্য রাজ্যের নানা বিভাগীয় কর্ম্মচারীর মতামত লইয়া স্যর ফারিদুন মুল্ক একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজে স্বাক্ষর করিয়া মহামান্য নিজাম বাহাদুরের

নিকট উপস্থাপিত করেন। এইটি প্রধান মন্ত্রীরই কাজ। স্যর ফারিদুন অবসর-গ্রহণের পূর্ব্বে এরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়া যে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। স্যর ফারিদুন মহামান্য নিজাম বাহাদুরের সহিত একত্র অবস্থান করায় নিজাম বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার গুণ, প্রতিভা, ক্ষমতা ও রাজ্য-শাসন-কুশলতার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি স্যর ফারিদুন মুল্ককে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আওরঙ্গাবাদ জেলায় নবাব স্যর ফারিদুন মুল্ক বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহার নাম ছিল মিঃ ফারিদুনজী জেম শেঠজী। তিনি অল্প বয়স হইতেই নিজাম বাহাদুরের সরকারে প্রবিষ্ট হন। নিজাম সরকারে তাঁহার পিতাও কার্য্য করিতেন। কিছুকাল রেভিনিউ বিভাগে নিম্নতম কর্ম্মচারিরূপে কার্য্য করেন। আওরঙ্গাবাদ জেলায় যখন জরীপের কার্য্য আরম্ভ হয় তখন সেই জরীপের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করায় মিঃ ফারিদুনের নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আওরঙ্গাবাদ জেলায় জরীপের কার্য্যের সফলতা দেখিয়া নিজাম বাহাদুর আপন রাজ্যের অন্যান্য জেলাও জরীপ করিবার ইচ্ছা করেন এবং মিঃ ফারিদুনকে সেই কার্য্যের ভার দেন। ইহার ফলে রাজ্যের রাজস্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আওরাঙ্গাবাদের প্রথম তালুকদার-পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পদে অবস্থান করিতে পারেন নাই। কারণ পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহাকে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট্ অফিসার-পদে নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় সেই বৎসরেই তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী দ্বিতীয় স্যর সালার জঙ্গ (২) তাঁহাকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত

করেন। তদবধি মহামান্য নিজাম বাহাদুর স্বহস্তে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সি-আই-ই, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সি-এস্-আই, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কে-সি-আই-ই ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সি-বি-ই উপাধি দেন। হায়দ্রাবাদ রাজদরবারও তাঁহাকে প্রথমে জঙ্গ, পরে দৌলা ও পরিশেষে মুল্ক উপাধি প্রদান করেন।

স্তর আসমল ঝাঁ বাহাদুর যখন হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রধান মন্ত্রী তখন মিঃ ফারিদুনজী পার্লামেণ্টের অনুসন্ধান কমিটিতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের মিল সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দরবার হয় সেই দরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দরবার হয় সেই দরবারে স্বয়ং ভারত-সম্রাট্ তাঁহাকে সি-এস্-আই উপাধি প্রদান করেন।

স্তর ফারিদুন সামাজিকতায় হায়দ্রাবাদে অগ্রগণ্য। তাঁহার বাটীতে সমস্ত শ্রেণীর লোকের অবাধগতি। কি ইউরোপীয়, কি ভারতবাসী সকলেই তাঁহার বাড়ীতে সমভাবে আদৃত।

স্তর ফারিদুন মৃতদার। তাঁহার একমাত্র পুত্র মিঃ রুস্তমজী কৈসর-ই-হিন্দ্ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ রুস্তমজী মধ্যপ্রদেশের ডেপুটি কমিশনার। পিতার ন্যায় মিঃ রুস্তমজীও রাজকার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তিনিও যে একজন কীর্ত্তিমান্ লোক হইবেন তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

স্তর ফারিদুনের দুই ভাই, নবাব বুর্জ্জ জঙ্গ ও মিঃ সোরাবজী জেমশেঠজী। ইঁহারা দুইজনেই হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সুবেদারের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

শুর ফারিদুনের অনেক গুণ। তিনি ক্রীড়া করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ ক্রীড়ানিপুণ ছিলেন। এই বৃদ্ধ দশায়ও তাঁহার মন হইতে খেলিবার প্রবৃত্তি দূর হয় নাই। যখনই তিনি অবকাশ পান তখনই মৃগয়া করিতে বাহির হন।

শুর ফারিদুন একজন সাহিত্যিক। তিনি ভারতের অনেক ইংরাজী পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অনারেবল খাঁ বাহাদুর এ-কে-জি আহম্মদ থাম্বি মরিকেয়ার

দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে মাননীয় খাঁ বাহাদুর এ-কে-জি আহম্মদ থাম্বি মরিকেয়ার সাহেব বাহাদুর সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি দেশবৎসল, ধনী ব্যবসায়ী এবং মুসলমান সমাজের নেতা। এই অসামান্য পদগৌরব তিনি নিজের চেষ্টায় ও যত্নে লাভ করিয়াছেন। তিনি আপন বলে আজ দক্ষিণ ভারতের মধ্যে অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাননীয় মরিকেয়ার বাহাদুর নেগাপটম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পিতার নাম এ-কে গুলাম মহিদীন মরিকেয়ার। তিনি এখন পরলোকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মরিকেয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা দেখাইতে লাগিলেন; যেদিন হইতে তিনি তাঁহার পিতার সহিত ব্যবসায়-কার্য্যে যোগদান করিলেন তদবধি তাঁহার পিতার ব্যবসায়-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মিঃ মরিকেয়ার বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। তিনি বহুদিন হইতে ব্রিটিশ ভারতীয় বাষ্পীয় পোত কোম্পানীর (British Indian Steam Navigation Company Limited) সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি শুধু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীই নহেন, পরন্তু একজন জমিদার। ইঁহার ব্যবসায়-কার্য্যের অনেক শাখা মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ, ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট ও মালয় রাজ্যে আছে। তিনি প্রভূত টাকার মালিক হইলেও সাধারণ ধনীদিগের ন্যায় কেবল আপন

সম্ভোগের জন্য টাকা-কড়ি সঞ্চয় করেন না। তিনি জানেন, দেশবাসী ও তাঁহার আপন সমাজস্থ লোকদিগের তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের উপর দাবী আছে। তিনি সাধারণের উপকারের জন্য যে কত কার্য্য করিয়াছেন তাহা এরূপ সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি আপন ব্যয়ে মুসলমান গোসা মহিলাগণের জন্য নেগাপটমে একটি মুসলমান হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই হাঁসপাতালের নাম লর্ড পেট্‌ল্যাণ্ডের নামানুসারে রাখা হইয়াছে। ১৯১৪ সালে তিনি মুসলমান সাধু সৈয়দ উথম্যান সাহেব ও সৈয়দ আহম্মদ সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার্থ ভেল্লিপাল্লায়াম রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি দর্গা নির্ম্মাণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাপায়ুর নামক স্থানে একটি জুম্মা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছেন।

১৯১১ খৃঃ অব্দে তিনি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহার্থ যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক প্রযত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা-বিষয়ে তিনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাঞ্জোর জেলা শিক্ষা-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক আহুত হইয়া নিম্নলিখিত কমিটী-সমূহে কার্য্য করিয়াছেন :—

(১) ফিমেল্‌ এডুকেশন্‌ কমিটি। (২) বয়েজ এলিমেণ্টারী এডুকেশন্‌ কমিটি। (৩) প্রভিন্সিয়াল রিক্রুটিং বোর্ড্‌। (৪) সিপ-বিল্‌ডিং কমিটি। (৫) নেভিগেসন্‌ স্কুল্‌ কমিটি। (৬) মিউনিসন্‌ বোর্ড। (৭) ফুড-ষ্টাফ্‌স্‌ কমিটি। (৮) সোলজার্‌স্‌ বোর্ড। (৯) সিভিল্‌ সাপ্লাইস্‌ কমিটি।

যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল,—তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে যুবরাজ মাদ্রাজে পদার্পণ করিলে মিঃ মরিকেয়ার মাদ্রাজ প্রদেশের পক্ষ হইতে যুবরাজের নিকট অভ্যর্থনা-পত্র পাঠ করেন। তিনি নিম্নলিখিত বিলগুলি সংশোধন করিবার নিমিত্ত অনেক কমিটিতে কার্য্য করিয়াছেন :—

(১) ডিষ্ট্রীক্ট মিউনিসিপ্যালিটিস্ বিল্। (২) লোক্যাল বোর্ডস্ বিল্। (৩) ষ্ট্যাণ্ডিং এণ্ড সিপিং ফিজ্. বিল্। (৪) এলিমেণ্টারী এডুকেশন্ বিল্। (৫) ম্যাড্রাস প্ল্যাণ্টার্স লেবার্স বিল্।

জনসাধারণের উপকারার্থ কার্য্য করিতে মিঃ মরিকেয়ার সর্ব্বদাই আনন্দ পাইয়া থাকেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে নেগাপটমে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি তাহার প্রকোপ নাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার মত হইয়াছিল; তখন মিঃ মরিকেয়ার একটি চাউল-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া নিজেই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের জন্য দশহাজার টাকা দান করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতের-মুসলমানদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মরিকেয়ার সাধারণের হিতকর এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন যে, ১৯১৬ ও ১৯১৯ সালে আবার তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদে মাদ্রাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সকলেই জানেন, রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ মরিকেয়ার সমাজের ও দেশের অনেক হিতকর প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত করিতেছেন। তিনি দুই দুইবার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অর্থনৈতিক কমিটিতে (Finance Committee) প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানু-সারে প্রতি শুক্রবারে মুসলমান কর্ম্মচারিগণকে দুই ঘণ্টা কাল জুম্মা

প্রার্থনার জন্য সরকার ছুটি দিয়া থাকেন। ইঁহারই প্রস্তাবানুসারে সরকার এক্ষণে বকৃরিদ, মহরম ও বরওয়াকাত উৎসবে আফিস-আদালত-সমূহ বন্ধ করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের মৃতদেহ কোন প্রকারে চিতানলে ভস্মীভূত না করিয়া কবরে সমাধি দেওয়া হইবে—এই আদেশ সরকার তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে দেন। বিদেশে যাইবার সময় পাস-পোর্ট লইতে গেলে প্রত্যেক যাত্রীকে তাহার প্রতিকৃতি (Photo) পাঠাইতে হয়, কিন্তু মিঃ মরিকেয়ারের চেষ্টায় গোসা মহিলারা এই ফটো দেখানোর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। কোন গোসা মহিলার শব-ব্যবচ্ছেদ (Post mortem) করিতে হইলে এখন মহিলা ডাক্তার দিয়া তাহা করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহাও মিঃ মরিকেয়ারের প্রস্তাবের ফল।

১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি নেগাপটম্ তালুকবোর্ডের বে-সরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিঃ মরিকেয়ার কয়েকবার নেগাপটম্ মিউনিসিপাল সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। তিনি এখনও মিউনিসিপ্যাল কৌন্সিলের সভ্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি জেলা বোর্ডের বহু পুরাতন সভ্য। মিঃ মরিকেয়ার বিগত যুদ্ধের সময় নানা প্রকারে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ওয়ার ফণ্ড কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধের সাহায্যকল্পে প্রভূত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের হাঁস-পাতাল রক্ষা-কল্পে তিনি মাসিক একশত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। তিনি ওয়ার ফণ্ডের মহিলা-সাহায্য-ভাণ্ডারে অনেক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। একবার তিনি মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্য-দলকে তিন হাজার টাকা মূল্যের সিগারেট প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-ঋণ-ভাণ্ডারে ৩৫০০০৲ টাকা, ওয়ার ফণ্ডে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা এবং ভিক্টরী মেমোরিয়াল ফণ্ডে ১০০০৲ এক হাজার টাকা

প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ মরিকেয়ার মহামান্য যুবরাজের অভ্যর্থনা-কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই অভ্যর্থনা-সমিতিতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মহামান্য ডিউকের কাপের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে জাপান হইতে নানাবিধ বাজী আনাইয়া এই উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নেগাপটমে তাঁহার বাড়ীতে যে কেহ অতিথি হইয়া যাউন, তিনি সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড ও লেডী পেট্‌ল্যাণ্ড এবং লর্ড ও লেডী উইলিংডনকে তিনি নাগাপটমে যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কোনমতেই ভুলিতে পারিবেন না।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে তাঁহাকে দরবার পদক প্রদান করা হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন রাজার জন্মদিন উপলক্ষে তিনি "খাঁ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিঃ মরিকেয়ার মধ্যপন্থী দলভুক্ত। ক্রমে ক্রমে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে উচ্চপদলাভে অধিকারী হওয়াই তাঁহার মত।

১৯১৭ সালের ১৪ই মার্চ্চ ডাক্তার টি এম্ নায়ার 'Our immediate political outlook' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেই সভায় মিঃ মরিকেয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সভায় সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন—"ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট না থাকিলে আমরা আরও পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হইব। আমরা যতই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সবল করিয়া তুলিব ততই আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে।"

মিঃ মরিকেয়ার মুখে যাহা বলেন, কার্য্যতঃ তাহা করেন। তিনি দাতা, পরহিতৈষী, সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী, রাজভক্ত এবং দেশবৎসল।

নবাব স্যর খাজা আহ্সান উল্লা বাহাদুর

বাঙ্গালার মুসলমান ভূস্বামীদিগের মধ্যে ঢাকার নবাব-বংশ গৌরবে ও প্রাচীনত্বে শীর্ষস্থানীয়। এই বংশের ইতিহাস সুধীবর্গের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। শিক্ষা-প্রচার, দেশের হিতকর কার্য্য প্রভৃতি যে কোন অনুষ্ঠানে এই বংশের নবাবগণ পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সহানুভূতি ও উদ্যম প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এই আখ্যায়িকায় আমরা এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ নবাব স্যর খাজা আহ্সান উল্লা বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিলাম।

আহসান উল্লা নবাব স্যর খাজা আব্দুল গণি বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে ইনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঢাকায় বিদ্যার্জ্জন করেন। বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা প্রায়শঃ জমিদারী পরিচালনা ও প্রজারঞ্জনকার্য্যে অবহেলা করিয়া থাকেন। আহ্সান উল্লা বিদেশ-গমনের কুফল প্রাপ্ত হয়েন নাই ; এই হেতু তিনি উৎসাহী ও প্রজারঞ্জক জমিদার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৬৮-খৃষ্টাব্দে ইনি জমিদারী-পরিচালনায় নিযুক্ত হয়েন। জমিদার হইয়া ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন এবং বংশের গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন। লোকহিতকর কার্য্যে তিনি পিতার ন্যায় উৎসাহশীল ছিলেন এবং এই সকল কার্য্যে তাঁহার দান তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। স্যর খাজা আব্দুল গণি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই আহসান উল্লা সাহেব দানশৌণ্ডত্বের পরিচয় দিতে থাকেন।

জনহিতকর কার্য্য

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-দাতব্য-সাহায্য-ভাণ্ডারে তিনি ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে প্লেগ দেখা যায়। ঢাকায় যাহাতে ঐ মারাত্মক ব্যাধি উপস্থিত না হয় তজ্জন্য প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা হয়। নবাব আহসান উল্লা সাহেব এই উপলক্ষে ঢাকার কমিশনারের হস্তে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে ২০,০০০৲ টাকা দান করেন। তন্মধ্যে ৫, ১৫০৲ টাকা ঢাকা মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ হাঁস-পাতাল ও কয়েকটী বিদ্যামন্দিরে প্রদত্ত হয়। উক্ত বিশহাজার টাকার মধ্যে বাকী অংশ ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও মৈমনসিংহে পানীয় জল সরবরাহ জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-দাতব্য-সাহায্য-ভাণ্ডারে তিনি ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

বিরাট দান

নবাব স্যর আহ্সান উল্লা বাহাদুরের নিম্নলিখিত দানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা লর্ড ডাফরিণ অভ্যর্থনা-ভাণ্ডারে তিনি ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ঢাকার হোসেনী প্রাসাদ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে ভাঙ্গিয়া যায়। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌধ সংস্কার করিবার জন্য তিনি ১,০০,০০০৲ এক লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের জন্য তিনি ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপন করি-বার প্রস্তাব হইলে তিনি ২,০০,০০০৲ দুইলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মৃত নবাব স্যর খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর, জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অর্পণ করেন। উক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের নাম স্যর আহ্সান উল্লা বাহাদুরের নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্ববৃহৎ দান ঢাকা

সহরবাসীর স্মৃতিপথে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। ঢাকায় তড়িতালোক বিতরণ করিবার জন্য তিনি কমিটির হস্তে চারিলক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার মেসার্স এফ-সি অস্লার কোম্পানী এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় প্রথম আলোকোৎসব সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর ঐ উৎসবে যোগদান করিতে না পারায় তৎপরিবর্ত্তে রেভেনিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য অনারেবল মিঃ সি-ডব্লিউ বোল্টন, সি-এস, সি-আই-ই ঐ উৎসব সমাধা করেন।

সম্মান ও উপাধি

তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীতে কিছুকাল কমিশনাররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আরূঢ় থাকিয়া সরকারের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নবাব বাহাদুর দুইবার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন, প্রথমে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে।

তাঁহার দান ও সাধারণের হিতকর কার্য্য-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া সরকার বাহাদুর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর উপাধি দেন; তৎপরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নবাব উপাধি দেওয়া হয়। নবাব সাহেব ক্রমান্বয়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সি-আই-ই ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট নবাব বাহাদুরের প্রতি উপাধি-বর্ষণে কার্পণ্য করেন নাই। ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ডায়-মণ্ড জুবিলি উৎসব উপলক্ষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে নবাব বাহাদুরকে মহাসম্মানজনক রাজানুগ্রহ-চিহ্নস্বরূপ কে-সি-আই-ই উপাধি দেওয়া হয়।

চরিত্রবান্ পুরুষ

নবাব আহ্সান উল্লা একজন চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার সাধুচরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া ঢাকা সহরের অধিবাসীরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি তিনবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পত্নী জীবিত থাকা কালীন পুনরায় বিবাহ করেন নাই। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—(১) হাফেজ উল্লা, (২) সলিম উল্লা; দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে খাজা আতিকুল্লা নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন পুত্রসন্তান হয় নাই।

মৃত্যু

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে নবাব আহ্সান উল্লা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং ঢাকা সহরেই জীবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে ঢাকা নগরীর অধিবাসিবৃন্দ শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য সেদিন ঢাকার সমুদয় আফিস, আদালত ও বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর জন উডবার্ণ নবাব বাহাদুরের এষ্টেটের চীফ ম্যানেজার মিঃ জি·এল গার্থের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করেন—"I am most deeply grieved to hear of the Nawab's death. His generosity and integrity of character endeared him to all who knew him and I lose a friend for whom I had the strongest esteem and affection. Pray convey to the family the deep sympathy of the Government in their great bereavement." অর্থাৎ নবাবের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে আমি নিতান্ত

মর্ম্মাহত হইয়াছি। উদারতা ও সাধু চরিত্রের গুণে তিনি সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমি এমন একজন বন্ধু হারাইয়াছি যাঁহাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতাম। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন।

বাঙ্গালা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ তৎপরদিনই কলিকাতা গেজেটে গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ জে-এ বোর্ডিলনের স্বাক্ষরিত একখানি ইস্তাহার মুদ্রিত করেন। ইস্তাহারটী এই :—"The Lieutenant-Governor has heard with profound regret of the death of Nawab Bahadur Sir Khwaja Ahsanulla, K. C. I. E of Dacca, which took place very suddenly on the afternoon of the 16th instant. For more than thirty years he has been in effect the most prominent man of Eastern Bengal. To great natural abilities he added spotless integrity of character, broad sympathies, and an unstinted liberality. His ripe judgment and wise councel were ever at the service of the Government, while his striking personality won for him universal affection, and a unique influence among his countrymen. His great wealth was continuously used for the good of others. In him the State has lost a valued counsellor, and the Lieutenant-Governor a personal friend, while his death will be deplored throughout the provin ce."

নবাব বাহাদুরের মৃত্যুতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট উক্ত ইস্তাহারে তাঁহার গুণাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুরের সাধু প্রকৃতি, জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও দাতাকর্ণের ন্যায় দান—এই সকল সদ্‌গুণের স্মৃতি চিরদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

সৈয়দ হাসান ইমাম

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় এমন কোন লোক যদি বিহারে কেহ থাকে, তবে তিনি সৈয়দ হাসান ইমাম। যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হয়, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র-বল দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ না করিয়া পারেন না।

মিঃ হাসান ইমাম এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের বংশধর। ভারতে মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ মাল্লা সৈয়দ আওরেঙ্গজেবের গৃহশিক্ষক ছিলেন। মাল্লা সৈয়দের পুত্র নবাব সৈয়দ খাঁ সম্রাটের উজির হইয়াছিলেন। সৈয়দ হাসান ইমামের একজন পূর্ব্বপুরুষ নবাব মির আসকারী লর্ড ক্লাইবের সময় বাঙ্গালার নবাবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মিঃ হাসান ইমামের প্রপিতামহ খাঁ বাহাদুর সৈয়দ ইমদাদ আলি পাটনার সব জজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র খাঁ বাহাদুর সামশুল উলেমা সৈয়দ ওহিদ্দিন ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও জেলা-জজ হইয়াছিলেন। মিঃ হাসান ইমামের পিতা সামশুল উলেমা নবাব সৈয়দ ইমদাদ ইমাম পাটনা কলেজের ইতিহাস ও আরবীশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। উর্দ্দু ভাষার কবি হিসাবে আজিও তাঁহার নাম বিহারের সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের দ্বারাও বহু দরিদ্র লোকের সেবা করিতেছেন বলিয়া অনেকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে। তিনি যেমন একজন পাকা শিকারী, তেমনি একজন পাকা খেলোয়াড়, এক্ষণে তাঁহার বয়স প্রায় অশীতিবর্ষ। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিঃ সৈয়দ সরফুদ্দীন ইমামের মাতুল; তাঁহার অন্যতম মাতুল সৈয়দ নসীরুদ্দিন ভূপাল রাজ্যের অর্থসচিব

ছিলেন। মিঃ ইমামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যর সৈয়দ আলি ইমাম কে-সি এস্-আই বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি দেশবিখ্যাত, সুতরাং তাঁহার পরিচয় এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্যর আলি ইমাম হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসন-পরিষদের সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম পাটনা জেলার নেওরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব ও বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত রুগ্নদেহ ছিলেন। এত রুগ্ন ছিলেন যে, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে একদিন সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করে। তার পর তিনি তাঁহার পিতার চিকিৎসানৈপুণ্যে সুস্থ হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাইয়া ছিলেন। মিডল টেম্পল লাইব্রেরীর উপস্থিতির খাতা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে,তিনি সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কেবল নানাবিধ বই পড়িতেন ও নোট লইতেন। তিন মাস ইংলণ্ডে অবস্থানের পর তাঁহার বন্ধু বিহারের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক মিঃ এস্ সিংহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে ইতিহাসের বক্তৃতা শুনিতেন। তাহা ছাড়া মিঃ ইমাম প্যাডিংটন পার্লামেণ্টে নিয়মিত যোগ দান করিতেন, তিনি উহার নেতাও ছিলেন। কিন্তু নিজের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর স্বার্থে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি লণ্ডনের Indian Societyর সম্পাদক ছিলেন, মহামতি দাদাভাই নৌরজি এই সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। লণ্ডনের আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়ারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি চারি মাস কাল মিঃ উইলিয়ম ডিগবীর সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে

তাঁহার সহিত ওয়েলসে ঘুরিয়াছিলেন। মিঃ ডিগবীও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, মিঃ ডিগবী তাঁহার সমস্ত পুস্তক 'with the author's esteem' এই কথা স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মহামতি দাদাভাই নৌরজি সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌বেরি হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলে, মিঃ হাসান ইমাম নৌরজী মহোদয়ের সাফল্যের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এসময়ে তিনি প্রত্যেক পদস্থ ইংরাজের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিতেন, ইহা সামান্য রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় নহে। সেবার নৌরজী মহোদয় পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিছুদিন মিঃ ইমাম পাটনা হাইকোর্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিষ্টার ছিলেন। পাটনা হাইকোর্টের মধ্যে এমন কোন বড় দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা হয় নাই যাহাতে মিঃ ইমামকে কোন না কোন পক্ষ টানিবার জন্য চেষ্টা করে নাই।

১৯১০ সালে মিঃ ইমাম পাটনা হইতে কলিকাতা হাইকোর্ট চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়াও তিনি বহু মোকদ্দমা পাইতে থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স তাঁহার আইন-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের জজায়তী লইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনিও ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে জজীয়তী গ্রহণ করেন। বিচারাসনে বসিয়া তিনি সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচার দেখাইয়া সকলেরই প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। অতঃপর পাটনা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে বিহারবাসিগণ মিঃ ইমামকে কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে পাটনা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

মিঃ ইমাম ফৌজদারী আইন ও দেওয়ানি আইন সম্বন্ধে অনেক নজীর আইন-ব্যবসায়ীদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার রায়ে বাহ্য আড়ম্বর

নাই ; পরন্তু অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-বহুল সুন্দর মন্তব্যসমূহ বিদ্যমান। মিঃ জ্যাক্‌সন ও মিঃ নর্টনের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যারিষ্টারেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে পাটনায় যাওয়ায় লর্ড সিংহ, স্যর প্রভাস চন্দ্র মিত্র ও মিঃ সি আর দাশ দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বিহার-গমনে বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহও গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। বাঙ্গালা তাঁহার অবর্ত্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বিহার লাভবান্ হইয়াছে। কলিকাতার আর্দ্র জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের এতদূর হানি করিয়াছিল যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার কলিকাতা হাইকোর্টের সোপানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় যদিও তিনি তখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি অবকাশ পাইলেই পাহাড়ে যাইতে ছাড়িতেন না, তত্রাচ তিনি আর সেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তিনি পাটনা হাইকোর্টে জজ-স্বরূপে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমলাতন্ত্র তাঁহাকে সে সুবিধা দেন নাই। কাজেই তিনি পাটনায় গিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। অল্প-দিনের মধ্যেই পাটনায় তিনি তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ পুনরায় লাভ করিলেন। অবশ্য পরে তাঁহাকে পাটনা হাইকোর্টের জজিয়তী লইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু এ সময়ে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তিনি মনে করিতেন, জজীয়তী গ্রহণ করিলে তিনি দেশের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন। কাজেই তিনি জজীয়তী পরিত্যাগ করিয়া যথারীতি ব্যারিষ্টারী করিতে লাগিলেন।

ব্যারিষ্টারীতে যেমন তিনি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। দেশের উন্নতি-সাধনই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। তিনি পাটনা মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। একবার তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন—Let the motherland be the first in your affec-

tions, your province the second and your community wherever there-after you choose to put it "অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে স্বদেশ, তাহার পর নিজের প্রদেশ ও সর্ব্বশেষে নিজ সম্প্রদায়ের কথা ভাবিবে। তিনি মুখে যাহা বলেন, কার্য্যতঃও তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমান চক্ষে দেখেন। যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে কখনও আলিগড় ও বারাণসী এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সমান অংশে অর্থ দান করিতেন না। বিহারের জাতীয় বিদ্যালয়ে (Behar National College) তিনি অযাচিতভাবে অনেক অর্থদান করিয়াছেন। এক সময়ে কলেজে অত্যন্ত অর্থাভাব হয়, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কলেজটির নাম কাটিয়া দিতে প্রস্তুত হন, সেই সময়ে সৈয়দ হাসান ইমাম প্রয়োজনীয় টাকা দিয়া কলেজটিকে রক্ষা করেন। প্রত্যেক বৎসর তিনি বিহার ন্যাশনাল কলেজে এক হাজার টাকা প্রদান করিতেন। তিনি অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। Behari Students' Associationকে তিনি অনেক প্রকারে সহায়তা করিয়া থাকেন। গয়ায় ১৯০৯ সালে বিহারী ছাত্রদের যে কন্‌ফারেন্স হয়, তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতায় ছাত্রদিগকে 'সাহস' অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে মিঃ ইমাম বিহার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। সেই কন্‌ফারেন্সে শ্রীমতী বেসান্তের নির্ব্বাসনের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই কন্‌ফারেন্সে তিনি বলেন---It is because we are satisfied that there can be no political and economic progress in our land till the bureacracy is replaced by popular legislatures with full control over the executive and the judiciary that we have placed before us as the

goal of our aspiration, the establishment of self-governing institutions in this country. It is idle to tell us that the bureacracy have done for us this, that and the other that they have given us good governments with its commitants of peace and contentment. Good government which the bureacracy profess to have given us is no doubt better than no government, but in the first place good government need not be necessarily synonymous with bureacratic government......But about one thing we should be under no delusion and that is that whether we get it now or later, to-day or to-morrow, we shall come into our birth-right and nothing—nay, no power on earth—can keep us out of our inheritance, if only we ourselves are not slack in pressing our demands earnestly, forcefully and constitutionally on the attention of the Great Britain democracy who are the real sovereign power in the State. অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে প্রকার রুদ্রনীতির পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমাদের জন্মগত অধিকার লাভ করিতে গেলে আমলাতন্ত্রের হাতে আমাদিগকে এই প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেই হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের জন্মগত অধিকারে বাধা উৎপাদন করিতে পারে।

বিহারের হিন্দুরা ধর্ম্মান্ধতাপ্রযুক্ত সমুদ্রযাত্রার কখনই অনুকূল ছিলেন না, তাঁহারা ইউরোপ-গমনেচ্ছু যুবকগণকে কোন মতেই ইংলণ্ডে যাইতে দিতেন না। ১৯০৮ সালে নন্দকিশোর লাল ছয়টি

যুবককে ইংলণ্ড পাঠাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিহারী হিন্দুসমাজ তাঁহার বিরোধী হন। তখন সৈয়দ হাসান ইমাম একটি সান্ধ্যসমিতির আয়োজন করিয়া বিহারের প্রধান প্রধান হিন্দুদিগকে আমন্ত্রণ করেন এবং সেই নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ যুবকগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

১৯১১ সালে সৈয়দ হাসান ইমাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলে আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টি হন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহার্থ বিহারে যে কমিটি গঠিত হয়, তিনি সেই কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক রবিবারে বিহারের একটি না একটি সহরে যাইয়া অর্থভিক্ষা করিতেন।

"Beharee" নামক সংবাদপত্রের পরিচালক-বোর্ডের তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের জজ হওয়ায় Beharee পত্র বনেলি রাজের হস্তে হস্তান্তরিত হয়। মিঃ ইমাম জজীয়তি হইতে অবসর লইয়া বিহারে যাইবার পর দেখিলেন, Beharee পত্রের প্রকাশ লোপ পাইয়াছে। তাই তিনি মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের সহিত একযোগে ১৯১৯ সালের ১৫ই জুন Searchlight পত্র প্রকাশ করেন। যদি এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য না করিতেন অথবা যদি এই পত্রের সমস্ত ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি দায়ী না থাকিতেন, তাহা হইলে Searchlight কখনই প্রকাশিত হইত না। বিহারে Searchlightএর ন্যায় প্রভাবশালী সংবাদপত্র আর দ্বিতীয় নাই।

এরূপ একজন একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে দেশবাসী কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ের জাতীয় মহাসমিতির যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তিনি সেই

অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-শাসন-সংস্কার গ্রহণীয় কি না তাহার বিচারের জন্যই মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নেতৃগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের যবনিকাপাত হইয়াছিল, বোম্বাই কংগ্রেসে সেই মতভেদ ও মনোমালিন্য পুনরায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একদল ভারতবাসী বলেন, শাসন-সংস্কারে যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, ততটুকু লইয়াই কাজ করিয়া যাইতে হইবে, আর একদল বলেন, শাসন-সংস্কার unsatisfactory ও inadequate, অর্থাৎ অসন্তোষজনক ও আশানুরূপ নহে; সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে লুপ্ত মতভেদ স্পষ্ট হয়। এইরূপ সমস্যার সময়েই মিঃ হাসান ইমামকে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে ৺ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর দিনশা ওয়াচার মত মধ্যপন্থী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিলেও মিঃ ইমামের গুণে স্যর দিনশা পেটিট, মিঃ লালুভাই শ্যামলদাস, মাননীয় স্যর ফজিলভাই করিমভাইয়ের মত লোক কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। মিঃ হাসান ইমাম সেই কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন—Press your demands forcefully and insistently and if you are not heard now, your cause being righteous you will prevail in the end." অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ একাগ্রতার সহিত তোমাদের দাবী উপস্থিত কর; তোমাদের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, পরিণামে তোমরাই জয়ী হইবে।

মিঃ ইমাম এমন সুন্দরভাবে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, New Indiaপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—"But what makes the Congress a notable session—a really special session was the President. So amiable and strict, stern yet not harsh, accommodating yet not indul-

gent, conciliatory yet not compromising, it was a veritable Daniel that came to judgment. One curve of the lip, one nod, one glance, one gesticulation, one word of mouth uttered, one sign of sentiment expressed, one finger of the hand upraised was enough to hush all discord into harmony, to silence all disorder into peace, to reclaim a quiet in the midst of storm and strife." অর্থাৎ এবারকার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের বিশেষত্ব ইহার সভাপতি। এত মতভেদ, এত দলাদলি, এত বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি সকলেই মিঃ ইমামের একবার মস্তক-সঞ্চালনে, না হয় একবার অঙ্গুলি-হেলনে, না হয় একটি মাত্র বাক্য-উচ্চারণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন।"

মহাত্মা গান্ধী যখন রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করেন, মিঃ ইমাম তখন তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। শাসন-সংস্কার-বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিবার জন্য যখন ইংলণ্ডে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন ১৯১৮ সালে মিঃ ইমাম হোমরুল লীগের নায়ক-স্বরূপ ইংলণ্ডে যান এবং পার্লামেণ্টের সম্মিলিত কমিটিতে আপন পক্ষের মতামত ব্যক্ত করিয়া আইসেন। পঞ্জাবের হত্যা-কাণ্ড ও খেলাফৎ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—"There is no doubt that our faith in the honesty of the utterances of the British Cabinet has been greatly shaken by the first minister of the Crown having belied, by his present conduct and attitude, all his previous professions of goodwill towards Turkey and the question of Khilafat.

ডাঃ সৈয়ফুদ্দিন কিচলু

১৯২৯ সালে লাহোরে যে কংগ্রেসের চতুঃচত্বারিংশত্তম অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে লাহোরের অধিবাসিগণ ডাঃ সৈয়ফুদ্দিন কিচলুকে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসনে বরণ করেন। ডাঃ কিচলু একজন মুসলমান ব্যারিষ্টার এবং হাইকোর্টে তাঁহার বিশেষ পসার-প্রতিপত্তি আছে। মান্‌ষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি দর্শন-শাস্ত্রের ডাক্তার (Doctor of Philosophy) এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তিনি আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাদেশিকতার ভাবে প্রবুদ্ধ হন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার করিতে থাকেন। পঞ্জাবের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার মাতাও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টার ত্রুটির করেন নাই।

শৈশব হইতে তাঁহার সহিত ডাঃ সত্যপালের পরিচয় হয়। পরবর্ত্তী জীবনে একই কর্ম্মক্ষেত্রে সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। পঞ্জাবের অনাচার ও অত্যাচারের সময় এই দুই বন্ধু একত্র ইহার প্রতীকারে কৃতসঙ্কল্প হন। দুই বন্ধুকেই একই সময়ে ধর্ম্মশালা নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করা হয়। অমৃতসর রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারতীয়দিগের নিকট প্লাট্‌ফর্ম্ম টিকেট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই দুই বন্ধু এই নিয়মের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করায় ইঁহারা জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। রাউলাট আইনের সময়েও দুই বন্ধুতে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহারা

সত্যাগ্রহ ঘোষণা করেন। পঞ্জাবে—বিশেষতঃ অমৃতসরে ডাঃ কিচলুর চেষ্টায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সবিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অমৃতসরে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে একটি বিরাট সভা হয়, সেই সভায় ৩৫ হাজার লোক যোগদান করিলেও একমাত্র ডাঃ কিচলুর চেষ্টায় কোন প্রকার গোলমাল হইতে পারে নাই। ডাঃ কিচলু সেই সভায় বলেন, দেশবাসী সকলে অহিংস থাকিয়া রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করিবেন। স্যর মাইকেল ওডায়ার এই সভার পর ডাঃ কিচলুকে অমৃতসরে অন্তরীণ করিয়া রাখেন এবং কোন সভাসমিতিতে যোগদান অথবা বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর নোটীশ দেন। ১০ই এপ্রিল ডেপুটী কমিশনার ডাঃ কিচলুকে ডাকাইয়া পাঠান। ডাঃ কিচলুর গ্রেপ্তার-সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র হাজার হাজার লোক ডেপুটী কমিশনারের বাংলাতে গিয়া উপস্থিত হইল। ডেপুটী কমিশনার ভয়ে ভীত হইয়া জনতার উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন এবং পঞ্জাবে তাহার ফলে সামরিক আইন জারি হইল। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, ডাঃ কিচলু পঞ্জাববাসীর কিরূপ প্রিয়।

হিন্দু-মুসলমানে একতার জন্য ডাঃ কিচলু আজীবন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে ধর্ম্মশালায় অন্তরীণ করা হইয়াছিল, কিন্তু অমৃতসর কংগ্রেসের প্রাক্কালে তাঁহাকে মুক্তি দান করা হয়। ১৯২৬ সালে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের প্রাক্কালে ডাঃ কিচলু সমগ্র বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রতি জেলায় তবলিগ ও তাঞ্জিম অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার দুইটি মাত্র সন্তান। আইন অমান্য করায় ডাঃ কিচলুর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

মিঃ আবদুল রসুল

ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ। ধর্ম্মসাধনা ও আচার-পদ্ধতি বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও একই দেশের জল-বায়ুতে, একই দিবাকরের তলে, একই জননী জন্মভূমির সুশীতল অঙ্কে উভয়ে লালিত পালিত। এই দুই সম্প্রদায়কে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেখিলে বস্তুতঃই প্রাণে অতুল আনন্দ হয়। যে সমস্ত মহাপুরুষ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ-বিক্ষোভের সৃষ্টি না করিয়া উভয় জাতির শুভমিলনের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জাতির ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সেই জন্যই মিঃ আবদুল রসুল আজিও দেশবাসীর এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাজন এবং এইজন্যই আজিও প্রতি বৎসর বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান একত্রীভূত হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। এস্থলে সংক্ষেপে মিঃ রসুলের পরিচয় প্রদান করা হইল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মৌলবী আবদুল রসুল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী গোলাম রসুল ত্রিপুরা জেলার গুনিয়া-ঙ্কের জমিদার ছিলেন। বাল্যাবস্থায় মিঃ রসুলের পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিতে থাকেন। ইঁহাদের পরিবারবর্গ অতঃপর কিশোরগঞ্জে যান, তথায় একটি গ্রাম্য স্কুলে রসুল সাহেবের শিক্ষা আরম্ভ হয়। অতঃপর তিনি ঢাকা গভর্ণ-মেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হইবার পর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার

সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে ইংলণ্ডে গিয়া অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দেন। মাতার পরামর্শানুসারে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ রসুল মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে লিভারপুলে যান। কয়েক বৎসর তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার জন্য লিভারপুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি লণ্ডনে গিয়া কিংস্ কলেজে যোগদান করেন। তথা হইতে তিনি অক্সফোর্ডে যান এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জোন্স্ কলেজ হইতে তিনি বি-এ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পাশ করেন। ঐ বৎসরই তিনি মিডল্ টেম্পল হইতে বি-সি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী এই উপাধি পায় নাই। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে তিনি তাঁহার মাতার অনুমতি লইয়া একজন ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে মিঃ রসুলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পরিচয় হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি ব্যারিষ্টারীতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই; কিন্তু ক্রমে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে থাকে এবং তিনি বিশেষ পসার-প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৮৯৯ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল পরীক্ষারও তিনি পরীক্ষক ছিলেন।

কিন্তু আইন ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা দেশের কাজ করিতেই তিনি সমধিক ভালবাসিতেন। মুসলমান সমাজ হইতে বহু-বিবাহ-প্রথা রদ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনীতি-বিষয়ে যাহাতে হিন্দুদের সহিত মুসলমানেরাও যোগদান করে তিনি তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গভঙ্গ হইলে

তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের নিমিত্ত উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য দেশ-পূজ্য সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, দেশপ্রাণ রসুল তাহাতে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময় যে সমস্ত স্বদেশী সভার অধিবেশন হইত, মিঃ রসুল প্রায় তাহার সকলগুলিতেই যোগদান করিতেন। দেশবাসী তাঁহার এই স্বদেশানুরাগের জন্য তাঁহাকে বরিশাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির আসনে বরণ করেন।

মিঃ রসুল অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীও এদেশকে তাঁহার জন্মভূমির ন্যায় ভালবাসিতেন এবং মনে প্রাণে এদেশের কল্যাণ কামনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, মিঃ রসুল অতি অল্প বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন এবং জীবনের অনেক পরিকল্পিত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার উপদেশ যে কত কার্য্যকর হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশমাতৃকার সেবার জন্য রসুল তিল তিল করিয়া আপনার জীবনদান করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গভঙ্গের পর বরিশালে স্বর্গীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে ও উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে দেশবাসী মিঃ রসুলকে সভাপতির আসনে বরণ করে। কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবর্গ যৎপরোনাস্তি অপমানিত হন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ পর্য্যন্ত প্রহৃত হয়। মিঃ রসুল পুলিশ-বাহিনীর অত্যাচার ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অতি ধীরতার সহিত কন্‌ফারেন্সের কার্য্য সমাধা করেন। সেই কন্‌ফারেন্সে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল :—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ !

আপনারা এ বৎসরকার কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদ প্রদান করিয়া যে গৌরব ও সম্মান দান করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে মুসলমানের মধ্যে এই সম্মানলাভ করিতে আমিই সর্ব্বপ্রথম। আমি মনে করি, আজ আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক মুহূর্ত্ত। গত বৎসর এই সম্মিলনীর অধিবেশন ময়মনসিংহে হইয়াছিল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত একবৎসর অতীত হইয়াছে। এই এক বৎসরে আমরা—দেখিতে পাইয়াছি কিভাবে আমলাতন্ত্র আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং এই এক বৎসরে আমলাতন্ত্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশবাসী কিরূপে স্বদেশীসাধনায় নিমগ্ন হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গত কন্‌ফারেন্সের পর হইতে সমগ্র জাতি সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সত্যই কি আমরা পরস্পরে বিভক্ত হইতে যাইতেছি? লর্ড কার্জ্জনই অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন আমাদিগকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ ভাবে যে আমাদিগকে বিভক্ত করা হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও মনে ভাবি নাই। লর্ড কার্জ্জন মনে করিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গভঙ্গ করিয়া তাঁহার দেশবাসীর নিকট খুব বাহবা লইবেন এবং তাঁহার একটু হুম্‌কীতেই ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা—একেবারে নতজানু হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে বসিবে। কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। তাঁহার পদত্যাগ-পত্র মন্ত্রিসভা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। একরূপ তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভারত-সচিব মিঃ ব্রডেরিক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দান করেন নাই। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর সিমলা হইতে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হইল।

সমগ্র জাতি মিলিয়া ইহাতে কত আপত্তি তুলিল কিন্তু কোন আপত্তিই টিকিল না। আজ ক্ষিপ্রগতিতে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গ সমাধা করিলেন, তিনি এত তাড়াতাড়ি এ কার্য্য করিলেন এই কারণে যে, বিলম্ব করিলে তাঁহার বড় সাধের ভেদনীতিতে পাছে কোন বাধা উপস্থিত হয়। ভারত-সচিব নিজে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গসম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ-পত্রের খসড়া কমন্স মহাসভার সম্মুখে না রাখিলে কোনও মতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে রাজী হওয়া যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও লর্ড কার্জ্জন বঙ্গবাসীকে বিভক্ত করেন এবং ভারত-সচিবের অনুমতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত করেন নাই। আসমুদ্র-হিমাচল পর্য্যন্ত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উঠে, ভারত-সচিব লর্ড কার্জ্জনকে পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গভঙ্গ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে জানান যে, তথাকথিত আন্দোলন হ্রাস পাইতেছে। যে রাজ-প্রতিনিধি এইরূপ মিথ্যা কথা প্রচার করিতে পারেন, তিনি এ সংসারে সকল কার্য্যই করিতে পারেন। শিক্ষিত, উচ্চবংশোদ্ভব ইংরেজগণ ইংলিস প্রণালী পার হইয়াই কিভাবে নিজেদের বিবেক ও ন্যায়-পরায়ণতাকে বিসর্জ্জন দেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীর উপর এত চটিয়া গেলেন কেন? তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠায় জ্ঞানহারা হইয়া মনে করিতেন, তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার কালে লর্ড কার্জ্জন মনে করিতেন, তাঁহাকে ভারতবাসী পণ্ডিত ও বড় রাজনীতিবিদ্ বলিয়া প্রশংসা করিবে। ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানিতেন না। ভারত-বিদ্বেষী সংবাদপত্রসমূহে তিনি যে সমস্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়াই তিনি ভারতবাসীর চরিত্র-সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি

শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ঘৃণিত বাঙ্গালী শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার স্বজাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। বিজিত প্রজার জাতি বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার স্বজাতির তুল্য হয়, ইহা তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বাঙ্গালা দেশেই লর্ড কার্জ্জনের শাসন-নীতির তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশেই সংবাদপত্রসমূহ অতিমাত্রায় শক্তিশালী এবং রাজনীতি-বিষয়ে কলিকাতা লণ্ডনের সমতুল্য। তিনি জানিতেন, আজ যাহা বাঙ্গালী বলে, কাল তাহা ভারতের লোকে করে। রাজনীতি-বিষয়ে বাঙ্গালী যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা দেখিয়া লর্ড কার্জ্জন ভীত হইয়া পড়েন। তিনি তাই হিন্দু-মুসলমানের একতা নষ্ট করিবার জন্য বঙ্গভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তাহা না করিলে যে এদেশে ব্রিটিশ শাসন সহজ ও সুকর হইতে পারে না।

বঙ্গদেশের শাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ অথবা বাঙ্গালার ছোটলাটের কার্য্যভার হ্রাস করিবার জন্য যে, লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। লর্ড কার্জ্জন আপন প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এবং একই দেশকে দুইজন শাসকের অধীন রাখিয়া, ভিন্ন ভিন্ন আইনের দ্বারা উভয় প্রদেশকে শাসন করিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ বাধাইবার জন্যই লর্ড কার্জ্জন এই কাজ করিয়াছেন। ইহা শুধু আমাদের অভিমত নহে; বড় বড় সরকারী, বে-সরকারী-এবং এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা দরকার হইয়া থাকে, তবে আমরা বলিতে পারি, বঙ্গ-দেশকে বিভক্ত না করিয়াও অন্য উপায়ে শাসনের সুব্যবস্থা করা যাইত।

বঙ্গবাসী একবাক্যে একজন সপারিষদ গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে। ইহার ফলে সিভিল সার্ভিসের

এক শ্রেণীর উগ্রমস্তিষ্ক, পক্ষপাতী শাসকের পরিবর্ত্তে আমরা অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ্‌কে আমরা শাসকরূপে পাইব। লর্ড মিণ্টো ভারতীয় কয়েক জনকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সরকারী চাকুরীতে বর্ণভেদের তারতম্য তিরোহিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের দুঃখ আমরা এখনও বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বঙ্গ-ভঙ্গের একটা অজুহাত দেখান হইয়াছিল যে, ছোট লাট বাঙ্গালার সমস্ত জেলা পরিদর্শন শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না। ছোট লাটের জেলা পরিদর্শনের দ্বারা কোন লাভ যে হয়, ইহা আমি মনে করি না। আমার বিশ্বাস ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতিই হয়। যে জেলাতেই ছোটলাট যাইবেন বলিয়া কথা হয়, সেই জেলাতেই প্রথমে একটী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়, জমিদার ও ধনী নাগরিকগণের নিকট হইতে একরূপ বলপূর্ব্বক চাঁদা আদায় করা হয়; তাঁহাদের নাম পাছে রাজভক্তিহীনদের তালিকাভুক্ত হয়, সেই ভয়ে তাঁহারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের যদি চাঁদা দিবার মত অর্থ না থাকে, তবে তাহা ধার করিয়া দিতে হয়। বাজী পোড়ান, ব্যাণ্ড বাজান ও তোরণ-দ্বার-নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ চাঁদা তুলিতে হয়। ব্যাণ্ড বাজিলে ছোট লাটের আগমন জানিতে পারা যায়। লাট সাহেব আসিয়া একটি দরবার করেন, স্থানীয় ধনী জমিদার অথবা বড় বড় ধামাধরাদের সহিত করমর্দ্দন করেন, কোর্ট, জেল ও স্থানীয় স্কুল মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং তার পর ভূরি-ভোজনান্তে প্রস্থান করেন। ছোট লাট স্থলপথে স্পেশাল ট্রেণে এবং জলপথে সুসজ্জিত ষ্টীমারে ভ্রমণ করেন। দেশের লোকের টাকায় ছোটলাট এইভাবে প্রমোদ-ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কি উপকার হয়? আমি ত কোন উপকারই দেখিতে পাই না। আমার নিকট ইহা একটা প্রহসন, সাধারণের

অর্থনাশ এবং স্থানীয় জমিদারদিগকে পীড়ন করা বলিয়া মনে হয়। ফলে জমিদারদের মধ্যে কেহ কেহ জমিদারী বিক্রয় করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করতঃ তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত দানের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন। যদি বঙ্গভঙ্গের ফলে লাট-বেলাটদের মফঃস্বল পরিদর্শন ব্যাপারটি ঘন ঘন হইয়া আইসে, তাহা হইলে জমিদারদের অস্তিত্ব যে শীঘ্রই লোপ পাইবে, সে সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভদ্রমহোদয়গণ, গভর্ণমেণ্ট যখন দেশবাসীর আবেদন, নিবেদন ও বাদ-প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া আমাদের মাতৃভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

আমাদের কর্ত্তব্য এই বঙ্গভঙ্গকে আদৌ স্বীকার না করা এবং ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে আমরা যেরূপ সম্মিলিত ছিলাম, সেইরূপ সম্মিলিত ও একত্রীভূত মনে করা। আজ আমরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এই কন্‌ফারেন্সে সম্মিলিত হইয়া সপ্রমাণ করিয়াছি যে, আমরা এখনও সম্মিলিত আছি। গভর্ণমেণ্ট কুড়ি ভাগে বঙ্গদেশকে বিভাগ করিলেও বাঙ্গালী জাতি কখনও বিচ্ছিন্ন থাকিবে না।

গত ১৬ই অক্টোবর আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা এই বঙ্গচ্ছেদকে কখনও মানিয়া লইব না। যদি সত্য সত্যই আমরা দেশদ্রোহী না হই—যদি সত্য সত্যই আমরা মাতৃভূমির প্রকৃত সন্তান হই, তাহা হইলে আমরা যেন সরকারী অনুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশায় আমাদের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত না হই। বঙ্গভঙ্গ নিশ্চয়ই রহিত হইবে। কিছু সময়ের জন্য মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে একযোগে নিঃস্বার্থভাবে ধৈর্য্যসহকারে কাজ করিয়া যাইতে পারিলে বঙ্গভঙ্গ নিশ্চয়ই রহিত হইবে। আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন

চালাইয়া যাইতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, স্ব স্ব চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। কোন কোন বে-সরকারী এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান প্রথমে এবিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অবশেষে গভর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িবার ভয়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের উদারনীতিক দলের নিকট হইতে আমরা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম। বিশেষভাবে মিঃ মর্লের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। যখন মিঃ মর্লের ন্যায় সাধু ও উদারহৃদয় লোকের নিকট হইতে আমরা কোন সাহায্য পাই নাই, তখন ইংলণ্ডের অন্য কোন রাজনীতিজ্ঞের নিকট হইতে আমরা যে কোন প্রকার সাহায্য পাইব, এ আশা সুদূরপরাহত। ইংলণ্ডের দুই দলের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা আমাদের পক্ষে মস্ত ভুল। রক্ষণশীল অথবা উদারনীতিকে যে দলই ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার কর্ত্তা হউন না কেন, ইঁহারা উভয় সম্প্রদায়ই ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইঁহারা ভারতবর্ষকে কঠোরভাবে শাসন করিয়া চিরপদানত করিয়া রাখিতে চাহেন। উভয় দলই ভারত-শাসন-বিষয়ে একই রুদ্রনীতির উপাসক। ভারতবর্ষের কোটি কোটি দীন-দুঃখীর দুঃখকষ্ট ও আর্ত্তনাদে তাঁহারা কর্ণপাত করেন না। কেবল উদারনীতিক দলের দুই একজন সভ্য ভারত-বিষয়ে একটু আধটু সহানুভূতির কথা বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদনেই পরিণত হয়। ইংলণ্ডের অধিকাংশ উদারনীতিক রক্ষণশীল-দেরই ন্যায় ভারত-বিষয়ে উদাসীন। কবডেন ও ব্রাইটের আমলে যে উদারনীতি ছিল, তাহা আর নাই; তাহার স্থলে ঘোর সাম্রাজ্যবাদ এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

ইংরেজ এখন উদার সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদারেরা কিভাবে আরও রাজ্য বিস্তৃত করিবেন ও ব্যবসায়বাণিজ্য একচেটিয়া করিবেন, কেবল সেই চিন্তা করেন। ইংরেজ আজ তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। ইংরেজের যদি বিবেক বলিয়া কোন বস্তু থাকিত, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর ঘোর অত্যাচার হইত না।

রক্ষণশীল দলের ন্যায় উদারনীতিক দলও ইংলণ্ডে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। এই সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পুত্রদের শীকার অর্থাৎ চাকুরী-সংগ্রহের ভারতবর্ষ একটি সুখময় স্থান। ভারতের সকল বিভাগের উচ্চ উচ্চ পদের জন্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে প্রতি বৎসর বহু শ্বেতাঙ্গকে আমদানী করা হয়। ইহারা আপন স্বার্থে আঘাত লাগিবার ভয়ে ভারতবর্ষকে কিছু দিতে পারেন না। কোন প্রকারে যদি এদেশের আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্রদের সুখের চাকুরীর পথরোধ হয়। কাজেই তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চান না।

উদারনীতিক দলের এইরূপ ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গভর্ণমেণ্ট অথবা উদারনীতিক দলের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া আন্দোলন চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ভারত-বাসীকে জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে গেলে আজ আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে অর্থাৎ আমাদিগকে কাজের লোক হইতে হইবে, শুধু মনে মনে কল্পনা করিলে হইবে না।

আত্মনির্ভরতা, স্বার্থহীনতা ও দেশাত্মবুদ্ধিতে আজ আমাদিগকে জাগরিত হইতে হইবে। এই গুণে যেদিনই আমরা গুণী হইতে পারিব সেই দিনই আমরা সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইব। কাগাশিমায়

জাপানীরা পরাভূত হইয়াছিল, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা এই কাগাসিমা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল; ইহার ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই উত্তেজনার ফলেই এড্‌মিরাল টোগো জাপানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। কাগাসিমার ধ্বংস জাপানের ভাবী বিজয়ের সূচনা করিয়াছিল। এই ধ্বংস-লীলা হইতেই তাহারা বুঝিয়াছিল যে, জাতি-হিসাবে বাঁচিতে গেলে তাহাদিগকে সকলপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া সকলকে একত্রীভূত হইতে এবং জীবন পণ করিয়া বৈদেশিকদের অত্যাচার-উৎপীড়ন রোধ করিতে হইবে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারা দেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সম্বন্ধীয় উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করে। এই সমস্ত শিখিবার জন্য তাহারা তাহাদের দেশের যুবকগণকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছে। তাহারা সৈন্যবলবৃদ্ধি ও নৌশক্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, কার্য্যেও তাহারা তাহা পরিণত করিয়াছে। রুসিয়ার সহিত প্রবল যুদ্ধে জাপানের সৈন্য-বাহিনী কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়ে একজন জাপানী ভদ্রলোক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে বলিয়াছিলেন যে, রুসিয়ার সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান যদিও শিল্প ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তথাচ সৈন্যবল না থাকায় লোকে জাপানকে "অসভ্যদেশ" বলিয়া বর্ণনা করিত। কিন্তু রুসের সহিত যুদ্ধে জাপান হাজার হাজার ইউরোপীয়কে হত্যা করিতে পারায় এখন জগতের মধ্যে অন্যতম "সভ্যদেশ" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীর একতা-বিনাশের জন্য যে চেষ্টা করেন, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের ক্ষতিজনক হইলেও, ছদ্মবেশে উহাকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। দেশের যে জাগরণ আমরা ৫০ বৎসরেও সৃষ্টি করিতে

পারিতাম না, তাহা বঙ্গভঙ্গের জন্য ছয়মাসে সাধিত হইয়াছে। এই বঙ্গভঙ্গের জন্য স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলন আজ আর বঙ্গদেশে আবদ্ধ নাই, সমগ্র ভারতে ইহা সুবিস্তৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন অর্থে যদিও কর্ত্তারা একটা ভয়ঙ্কর কিছু মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশ-সেবকের দেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। জননী জন্মভূমির সেবা কি কোনরূপে মন্দ হইতে পারে? স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি যেভাবে জন্মভূমির সেবা করিতে পারে পরাধীন দেশের অধিবাসীরা সেরূপ পারে না। আমরা সেনা-বিভাগে প্রবেশাধিকার পাই না, দেশের সামরিক নীতির পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের দেশে যত সৈন্য আছে—তাহা দেশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কি না এবং দেশের প্রয়োজনের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক কি না তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা দেশের লোকের নাই। আমরা ট্যাক্স প্রদান করি, কিন্তু সেই ট্যাক্সের টাকা দেশের কাজের জন্য ব্যয় করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। এ সমস্ত কার্য্য আমাদের কর্ত্তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতি আমাদের উপর নির্ভর করে। আমরা কিরূপ পণ্য ব্যবহার করিব, আর কিরূপ পণ্য বর্জ্জন করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করে। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে গেলে দেশের শিল্পজাত পণ্যসম্ভার ব্যবহার ও বিদেশী পণ্য একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের যে সমস্ত শিল্প লোপ পাইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে এবং বৈদেশিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই যে স্বদেশী আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল—স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন। এক সময়ে

আমাদের দেশ তুলাজাত বস্ত্রের জন্ত জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। এদেশেরই মসলিন ইউরোপখণ্ডের রাজন্যবর্গ মহাসমাদরে পরিধান করিতেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে বিদেশ হইতে বস্ত্রের আমদানী হইত না, এদেশে এত অধিক বস্ত্র উৎপন্ন হইত যে, দেশের লোকের অভাব মোচন করিয়া উহা বিদেশের বাজারে রপ্তানী হইত। আমরা স্বেচ্ছায় অবহেলা করিয়া এই বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করিয়াছি। আমরা এমনই কুশিক্ষা পাইতেছি যে, আমরা যাহা কিছু বিদেশী তাহারই দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকি, স্বদেশজাত জিনিষপত্র আর আমাদের ভাল লাগে না। ফলে এ দেশের বস্ত্রের বাজার আজ বিদেশী ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা নিজেরাই আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছি।

এক্ষণে দেশবাসী তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়াছে এবং আত্মকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করিতেছে। যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা—সকলেই আজ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে ইহাতে আমাদের সমুদ্রপারের বন্ধুদের পকেটে হাত পড়ায় তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে অসন্তোষের কিছুই দেখিতেছি না। গভর্ণমেণ্টও এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়া মহা খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে এই স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যেরূপ কঠোরভাবে দমননীতি চালাইতেছেন, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আমাদের শাসনকর্ত্তারা নিজ দেশবাসীদের স্বার্থের জন্য আমাদের মঙ্গলকে উপেক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

বঙ্গদেশে যুবকগণের চেষ্টায় এই স্বদেশী আন্দোলন কৃতকার্য্যতামণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া এই যে সমস্বরে

"বন্দে মাতরম্" গান করিয়া বেড়ান, ইহাই আমাদের শাসনকর্ত্তাদের নিকট মহাঅপরাধের বিষয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে জাতীয় সঙ্গীত গান করা পৃথিবীর কোন দেশেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে শাসনকর্ত্তাদের মর্জ্জি অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং তাঁহারা যাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা বে-আইনী না হইলেও তাহাকে বে-আইনী বলিয়া মনে করিতে হইবে। যাহাতে যুবকেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে না পারে, গভর্ণমেণ্ট সেই জন্য ছাত্রদিগকে রাজনীতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া সার্কুলার জারি করিয়াছেন। স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করা লোক কি না জানি না; কিন্তু তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে। রাজনীতিক সভাসমিতিতে যোগদান করা যে গ্রাজুয়েট কিংবা অণ্ডার গ্রাজুয়েটদের পক্ষে মহাঅপরাধজনক তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। আজ দেখিতেছি পূর্ব্ববঙ্গে নূতন রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই সার্কুলারকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ আইন-ব্যবসায়ী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু তথাপি এই সার্কুলার প্রত্যাহৃত হয় নাই। স্কুলের ছোক্‌রা ইনস্পেক্টরের দল ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর অযথা জুলুম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব হ্রাস করিতেছেন। এই অত্যাচারের বিপরীত ফল ফলিতেছে, ছাত্র ও শিক্ষকগণের মনে অবসাদের ভাব না আসিয়া বরং নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের অধিবাসিগণ ব্যবসায়-লোপের আশঙ্কায় আশঙ্কান্বিত, অপরদিকে—আন্দোলন-দমনে গভর্ণমেণ্টের কঠোর দমন-নীতি আমাদিগের মনে এই ধারণারই সৃষ্টি করিতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট যেভাবে হউক, এ দেশে স্বদেশী আন্দালন দমন করিয়া স্বজাতি ও স্বদেশবাসিগণের শিল্প-

ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রকার সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প।

আজ বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিবে। অন্য স্থান অপেক্ষা স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল-বাসী অধিকতর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করিয়াছে। বরিশালের যুবকগণ প্রথমে লাঞ্ছনার বিজয়-তিলক ললাটে ধারণ করিয়াছে। বরিশালে শ্বেতাঙ্গ মহিলাগণকে নির্য্যাতন করা হইয়াছে, এই অলীক ও মিথ্যা জনরবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্ট বরিশাল সহরে গুর্খা পুলিশ প্রেরণ করিয়াছেন। বরিশালের দুইটি গ্রামে পিউনিটিভ পুলিশও বসান হইয়াছে। বরিশালে ছোট ছোট বালকদিগকে বন্দে মাতরম্ গান করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হইতেছে। সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে গুর্খা পুলিশ নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা করিতেছে। সিরাজগঞ্জে ও আসামে পুলিশ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। বাঙ্গালী কখনও এই অত্যাচারের স্মৃতি বিস্মৃত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করিয়া থাকেন, এইভাবে মারধর ও লাঞ্ছনা-উৎপীড়ন করিয়া স্বদেশী আন্দোলন দমন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন।

এই বরিশালেই দেশমান্য নেতৃগণ এই প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, নেতৃগণকে এইভাবে অবমাননা করিয়া তিনি লোকসমাজে তাঁহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই নেতৃগণ তাঁহার ষ্টীমারে অতিথিরূপে গিয়াছিলেন, তাঁহার উচিত ছিল ভদ্রলোকের ন্যায় তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করা। কিন্তু স্যর ব্যামফিল্ড ভদ্রতা ও শিষ্টাচার কাহাকে বলে জানেন না। তিনি যাহাদিগকে অপমানিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মান-মর্য্যাদা

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনাদের পক্ষ হইতে আমি আজ এই নির্য্যাতিত নেতৃগণকে অভিনন্দিত করিতেছি। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের অধিবাসীরাও স্বদেশী সাধনায় মগ্ন হওয়াতে অনেক লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছেন। অত্যাচারের দ্বারা ক্ষণকালের জন্য কোন আন্দোলনের বাহ্যিক বিকাশ রোধ করিতে পারিলেও, স্থায়িভাবে কখনও সত্যকে নাশ করিতে পারে না। স্বদেশী আন্দোলন সত্য ও পবিত্র আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা, তথাচ এই আন্দোলন দেশে একটা মহাজাগরণের ভাব আনিয়াছে। এই আন্দোলন ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই আন্দোলন আত্মবিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগের শক্তি জাগাইয়া দিয়াছে। দেশবাসী এই আন্দোলন অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যদি অতীতের জন্য আমাদের কিছুমাত্র অনুশোচনা থাকে এবং মাতৃভূমিকে এতদিন অবহেলা করায় আমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র অনুতাপের ভাব জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনকে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে হইবে।

কোন কোন লোক স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেন, কিন্তু বয়কটের নিন্দা করেন। "বয়কট" কথাটি হয় ত কাহারও কাহারও কর্ণে বিরক্তিজনক হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকে কৃতকার্য্যতা-মণ্ডিত করিতে গেলে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। দেশে যে সমস্ত পণ্য উৎপন্ন হয়, যদি আমরা তাহা ক্রয় করি এবং বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করি, তাহা হইলে বিদেশী পণ্য "বয়কট" করা হইল। ইহাতে সরকার পক্ষ অথবা অন্য কাহারও আপত্তি ও রাগের কি আছে? আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের আমরাই কর্ত্তা এবং আমাদের নিত্যকার কি দ্রব্য প্রয়োজন তাহা আমরাই ভালরূপে পছন্দ করিতে পারি।

আমরা স্বাধীন জাতি নহি, আমাদের নিজেদের আইন-কানুন রচনা করিবার অধিকার নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত বিদেশী পণ্যের উপর অধিক মাত্রায় শুল্ক স্থাপন করিয়া আমরা ভারতের বাজার হইতে বিদেশী পণ্য বহিষ্কৃত করিতে পারি না। ইংলণ্ডে যখন প্রথম বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ড আইন করিয়া বিদেশী বস্ত্রের প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বিদেশী পণ্যের বর্জ্জন ভিন্ন স্বদেশী শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের প্রচার ও প্রসারের অন্য উপায় নাই।

ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জনের আমি একান্ত পক্ষপাতী। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট বহুবার অনুনয়-বিনয় করিয়াছে, ব্রিটিশজাতির নিকটেও আমাদের দুঃখের প্রতিকারের জন্য আবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। ব্রিটিশজাতি আমাদের প্রার্থনায় আদৌ কর্ণপাত করেন নাই।

বেশী দিনের কথা নয়, মাসিডন ও ক্রিট দ্বীপের স্বল্পসংখ্যক অধিবাসী সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে তাহাদের দুঃখ-দুরবস্থার কথা শুনিতে বাধ্য করিয়াছিল; কিন্তু আজ ৩০ কোটি হইলেও ব্রিটিশজাতি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। আমাদের এখন পূর্ণোদ্যমে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করা দরকার। যদি আমরা কয়েক বৎসর ধরিয়া এই "বয়কট" আন্দোলন চালাইতে পারি, তাহা হইলে ব্রিটিশজাতি আমাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইবে। গত ১০ মাসে আমাদের এই বঙ্গদেশে শিল্পকার্য্যের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছেন। জনসাধারণের মধ্যে যতই শিক্ষার বিস্তার হইবে, ততই এই আন্দোলন স্থায়ী হইবে। শিক্ষার অভাবেই আজ আমরা অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। মাত্র ৪০ বৎসর কাল স্বদেশে শিক্ষার বিস্তার করিয়া জাপান অসাধ্যসাধন করিয়াছে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-প্রণালীর উপর আমাদের যাহা কিছু

বিশ্বাস ছিল তাহা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (University Act) পাশ হইবার পর হইতে দূর হইয়াছে। তার পর যেটুকু বাকী ছিল পেড্‌লার সার্কুলার তাহাও তিরোহিত হইয়াছে। কাজেই অবিলম্বে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক যে বিপুল অর্থ দান করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা সমগ্র জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অতি সুলভে সাহিত্য ও শিল্প উভয় প্রকারের শিক্ষাদানই এই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, সমগ্র দেশে এইরূপ জাতীয় শিক্ষা-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই পরিষৎ বাঙ্গালার গৌরব। এই পরিষদের জন্য উপরোক্ত ভদ্রমহোদয় দুইজন যে ৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা বিরাট দান হইলেও সমুদ্রে শিশির-বিন্দুবৎ। বাঙ্গালা দেশের উপযোগী একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে এক কোটি টাকার প্রয়োজন। যদি ইংলণ্ডে লোকের দানের দ্বারা ৭।৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চলিতে পারে, তবে আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে পারিব না কেন? এত টাকা এখনই সংগ্রহ করা অসম্ভব তাহা আমি জানি, কিন্তু সকলেই যদি আমরা কিছু কিছু প্রদান করি, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। দেশকে জাতীয়ভাবাপন্ন করিতে হইলে দেশে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার করিতেই হইবে। দেশের লোকের এতদিন যে চেতনা হয় নাই এজন্য অনেকটা দায়ী দেশের তথা-কথিত নেতৃগণ। নেতৃগণ এতদিন ধরিয়া দেশবাসীকে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভাগ্যগুণে তাঁহারা একটি দয়াবান্ ন্যায়পরায়ণ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছেন, কাজেই তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন করা কোন মতেই উচিত নহে। গভর্ণমেণ্ট কৃপাপরবশ হইয়া যাহা দান করেন, তাহা বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা

উচিত। পরাধীন জাতিকে বিজেতাগণ যাহা দয়া করিয়া দেয়, তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। ট্যাক্স প্রভৃতি দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন, গভর্ণমেণ্ট আপনাদের যাহা কিছু কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন তাহা করিবেন।

তথাকথিত নেতাদের এই অযাচিত উপদেশের ফলে দেশ এতদিন রাজনৈতিক বিষয়ে আদৌ অগ্রসর হয় নাই। যদি আমরা তথাকথিত নেতাদের উপর নির্ভর না করিয়া আপনাপন বিচারশক্তি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা এতদিনে ব্রিটিশ-শাসননীতির চাতুর্য্য বুঝিতে পারিতাম। আমরা অনেক সময় শুনিতে পাইয়াছি যে, হিন্দুরা অতি রাজ-দ্রোহী জাতি; সুতরাং হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের যোগদান করা উচিত নহে। আমাদের সরকার আমাদিগকে বলেন যে, মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের সহিত যোগদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সরকার যাহাই বলুন, আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত না মিশিয়া পারি না। আমাদের পরস্পরের স্বার্থ এক। আমরা একই জন্মভূমির সন্তান। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুদের সহিত আমাদের মতবিরোধ থাকিতে পারে; কিন্তু রাজনীতিক বিষয়ে আমাদের উভয়ের স্বার্থ এক। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমরা মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসী আন্দোলনে হিন্দুদের সহিত মিশি নাই; গভর্ণমেণ্ট তখন আমাদিগকে বেশী পরিমাণে চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইতেন। কিন্তু তাহার ফলে আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি কি? আমরা অবনতির চরমসীমায় পৌছিয়াছি, আর হিন্দুরা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইংরেজ জাতি গুণের সমাদর করিতে জানে। তাহারা হিন্দু জাতির নির্ভীকতার জন্য তাহাদিগকে মনে মনে সম্মান করে। আর আমাদের দেশদ্রোহিতার জন্য মনে মনে আমাদিগকে ঘৃণা করে; কেবল রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইংরেজ মুখে মুখে আমাদিগকে আদর দেখায়। আমরা মনে করিতাম যে, আমরা যদি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকি, তাহা হইলে ইংরেজ আমাদিগকে সমস্ত সরকারী চাকুরী দিবে এবং সরকারী চাকুরীমাত্রই মুসলমানদের একচেটিয়া হইবে। কিন্তু তাহা হইয়াছে কি? কলিকাতা হাইকোর্টে তিনজন হিন্দু বিচারপতি আছেন, কিন্তু একজনও মুসলমান বিচারপতি নাই। হাইকোর্টে কি এমন কোন মুসলমান ব্যারিষ্টার কি উকিল নাই যিনি হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিতে পারেন? যদি সেইরূপ কেহ না থাকিত, তবে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে লাহোর কিংবা এলাহাবাদ হাইকোর্ট হইতে একজন মুসলমানকে কলিকাতায় আনাইয়া জজীয়তী দিতে পারিতেন। অন্যান্য বিভাগেও মুসলমানদের দাবীকে পদদলিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে আমাদের বুঝা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদের সহিত যোগদান করিয়া আমরা শক্তিশালী না হইতে পারিব, ততদিন গভর্ণমেণ্ট কোনমতেই আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না। আমাদের নিজেদের পথ নিজদিগকেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোন কোন মুসলমানকে বলা হইয়াছে যে, বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের উপকারের জন্য করা হইয়াছে; কারণ বহু মুসলমান ইহাতে চাকুরী পাইবে। সমগ্র জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করাতেই মুসলমান জাতির অধঃপতন হইয়াছে। দুই একজন মুসলমানকে চাকুরী দেওয়া হইতেছে বলিয়া বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করা আমার মুসলমান ভ্রাতাদের পক্ষে কখনই উচিত নহে। কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে মুসলমানদের কি পরিমাণ ক্ষতি হইবে, ইহা যদি তাঁহারা জানিতে ও বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে কখনই বঙ্গভঙ্গের সমর্থন তাঁহারা করিবেন না। আমাদের মধ্যে একজন মাত্র বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের মহালাভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

সেই মুসলমান ভদ্রলোকের ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গভঙ্গে স্বার্থ আছে; কিন্তু মুসলমান জাতির ইহাতে কি স্বার্থ তাহা পরে সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই ভদ্রলোকের কয়েকজন অনুচর বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করায় তাঁহাদিগকে স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার দারোগাগিরি দিয়াছেন। আমার অভিমত এই যে, মুসলমানদের প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের এই প্রকার অনুগ্রহ ভবিষ্যতে তাহাদের লাভ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি করিবে। মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদের বিচ্ছিন্নতা-সম্পাদনের জন্যই গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মনির্ভরশীল না হইলে মুসলমানেরা কখনই তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে না। কয়েকজন মুসলমান নেতা অজ্ঞ মুসলমানদিগকে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুদের আন্দোলন, উহাতে মুসলমানদের কখনও যোগদান করা উচিত নহে। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এই স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই অধিকতর লাভবান হইবে। এই স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা বয়ন-শিল্পের যে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মুসলমান বয়নকারীরাই অধিকতর লাভবান হইতেছে। বিড়ি তৈয়ারি করিয়া কলিকাতার বহু দরিদ্র মুসলমান দুই বেলা অন্নের সংস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্বে এক বেলাও অন্ন জুটিত না। হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর শিক্ষিত বলিয়া চাকরী-বাকরী ন্যায়তঃ তাহাদেরই প্রাপ্য; মুসলমানদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। অনেকে বলেন, দেশে শিক্ষার বিস্তার করা বিশেষ দরকার এবং দেশে শিক্ষার বিস্তার হইলেই বাহির হইতে আর আন্দোলনের দরকার হইবে না, আপনা হইতেই লোকে দেশের দুরবস্থা বুঝিতে পারিবে এবং তাহার প্রতীকারার্থ যত্নবান্ হইবে। এ কথা যে সর্ব্বাংশে সত্য, সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় শিক্ষার প্রচার দ্বারা লোকের চোখ ফুটাইতে হইবে। তখন দেশের লোক বুঝিতে পারিবে, আমরা চিরদিনই এরূপ ছিলাম না। আমাদের শাসনকর্ত্তারা যখন বর্ব্বরতার সীমা অতিক্রম করেন নাই, তখন আমাদের প্রাচীনেরা দেশ-বিদেশে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন। অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের গৌরবময় ভারত রচনা করিতে হইবে। এখন হইতে জাতীয়ভাবে সকল মূক-সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের পবিত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ যে সমস্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী দিবেন, গভর্ণমেণ্ট হয় ত তাহা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু দেশের লোক ত ইঁহাদিগকে অনায়াসে পালন করিতে পারেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শিল্পবিভাগে যাহারা উত্তীর্ণ হয় তাহাদের জন্য ধনীরা নানা শিল্পবিভাগ খুলিতে পারেন, আর জমিদারেরা সাহিত্য-বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আপন আপন এলেকায় নিযুক্ত করিতে পারেন। বঙ্গের বিজ্ঞান-সমিতি এ বৎসর ৪৪ জন যুবককে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমরা আশা করি, প্রতি বৎসর আরও অধিক-সংখ্যক প্রেরিত হইবে। কিন্তু শুধু পাঠাইলেই ত হইবে না, দেশে ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে তাহারা কাজ করিতে পারে, এজন্য টাকাকড়ি দিয়া দেশের লোকদিগকেই কারখানা খুলিয়া দিতে হইবে। দেশের লোক যদি দেশের দুর্দ্দশা-মোচনে এখনও কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। সরকারী চাকুরীর প্রলোভন আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। সরকারী চাকুরীর প্রলোভন বিশেষভাবে আমার স্বজাতীয়দিগকে অবনতির নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। সরকারী চাকুরী পাওয়াই আমাদের জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, অথবা খ্রীষ্টান হউক, কোন বাঙ্গালী কেরাণী সরকারী আফিসে প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে আকাশের চাঁদ হাতে পান। ইহা দেখিয়া ভারতের বাহিরের লোক যাঁহারা ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবাসীকে উপহাস করেন। বাঙ্গালী জাতি চাকুরী ছাড়িয়া কেন ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে না, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হন। আমরা একটি কেরাণীর জাতিতে পরিণত হইয়াছি। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং তাহা সংগ্রহ করিতেও অনেক সুপারিশের প্রয়োজন হয়। আর সে প্রতিযোগী পরীক্ষা নাই—সরকারী চাকুরী-ক্ষেত্রে গুণের সমাদর আর নাই। এখন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের যিনি যত কৃপালাভ করিতে পারেন, তাঁহার চাকুরীর পথ তত প্রশস্ত হয়। দেশের যত বড় বড় পদ তাহা ইংরেজ জাতির একচেটিয়া, ভারতবাসীকে সে সমস্ত পদে বহাল করিলে সরকারের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। ভারতবাসীরা ছোট ছোট অধস্তন চাকুরী পাইবারই উপযুক্ত, বড় কাজের তাঁহারা আদৌ উপযুক্ত নন। কিন্তু এই অধস্তন কর্ম্মচারীরাই যাহা কিছু কাজ-কর্ম্ম করে, উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীরা কেবল নাম সই করিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। উচ্চপদের জন্য পরীক্ষা ইংলণ্ডে হয়, সেখানে অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই যাইতে পারেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ—উভয় স্থলেই পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য আমরা কতবার প্রস্তাব করিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। যদি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের অনেক যুবক উচ্চপদ পাইত। আমাদের দেশের যুবকেরা যত উপযুক্ত হউক না কেন, শাসনকর্ত্তাদের স্বজাতির জন্য সমস্ত পদ শূন্য রাখিতে হইবে।

উদাহরণস্বরূপ কোন কোন ভারতীয় অধ্যাপক ইউরোপীয় অধ্যাপক অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে রহিয়াছেন, তাঁহারা ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অপেক্ষা কম বেতন পান। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ জে-সি বসুর ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকও অল্প দিন পূর্ব্বে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগে এই প্রকার অবিচার দৃষ্ট হয়। আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের জন্য কাঠ কাটি আর জল তুলি মাত্র। বস্তুতঃ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করা অপেক্ষা সামান্য দোকান করিয়া বসাও বরং লাভ। কোন জাতই চাকুরী দ্বারা বড় হয় নাই, কেহ হইবে না। চাকুরী মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে গেলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে আমাদের মন দেওয়া কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনে সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং ইহার বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের নেতৃবর্গকে বিশ্বাস না করিয়া গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার জারের ন্যায় দমননীতি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট জনসভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্মমূলক শোভাযাত্রা নিষেধ করিয়াছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। শাসিতের যদি সহানুভূতি না থাকে, তবে সে গভর্ণমেণ্ট কখনও শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে না। এই দমননীতির ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হইবে।

উপসংহারে আমি আমার মুসলমান ভাইদের কয়েকটি কথা বলিতে চাই। তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের ও সমগ্র জাতির ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছেন। এই স্বদেশী আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহা হইলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই বেশী উপকৃত হইবে। তথাপি যে মুসলমানেরা এই আন্দোলনে

হিন্দুদের সহিত যোগদান করিতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমি বিশেষভাবে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা হিন্দুদের সহিত একত্র রাজনীতিক আন্দোলন করুন। যদি মুসলমানেরা আরব, পারশ্য অথবা তুরস্কে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কথা নাই, কিন্তু বাঙ্গালায় থাকিতে গেলে বাঙ্গালার হিন্দুদের সহিত রাজনীতিতে তাহাদের মিশিতেই হইবে। আমরা সম্মিলিত থাকিলেই শক্তিশালী থাকিব এবং গভর্ণমেণ্ট আমাদের কিছুই করিতে পারিবেন না।

আজ বঙ্গের আকাশে ঘোর ঘনঘটা উপস্থিত, আমরা একত্রীভূত হইলে এই মেঘ কাটিয়া যাইবে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ একতাবদ্ধ বঙ্গদেশে মহাসুখে বাস করিতে পারিবে।

মৌলানা শিবলী নোমানী

মৌলানা শিবলী নোমানী একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা প্রদেশের আজমগড়ের অন্তঃপাতী একটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উকিল এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি লেখাপড়া শেষ করিয়া তীর্থদর্শনের মানসে আরবে যান।

আরব হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী হন এবং ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় করিতে তাঁহার মন লাগিত না, কাজেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আলিগড়ের এংগ্লো-ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবীয় শাস্ত্রের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন। স্যর সৈয়দ আমেদের সহিত এই সময় তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয় এবং তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশর, তুরস্ক ও এসিয়া মাইনর ভ্রমণ করিয়া অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে তিনি বিখ্যাত বীর ওসমান পাশার সহিত পরিচিত হন এবং সাহিত্য-সেবার জন্য মজিদিয়া ·দক পুরস্কার পান। স্যর সৈয়দের মৃত্যুর পর তিনি নিজাম রাজ্যের সাহিত্য-বিভাগের প্রধান কর্ত্তা-রূপে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়া "নদবট-উল-উলমা" নামক একমাত্র আরবীয় কলেজের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। আলিগড় কলেজে থাকার কালে তিনি সমস্-উল-

উলেমা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত হন এবং রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্যপদে বরিত হন। ১৯০৭ সালে এক দৈব দুর্ঘটনায় তাঁহার একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়।

মৌলানা সাহেব নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী লিখিয়াছেন—

(১) সীরাত-উন-নোমান—ইমান আবুহানিফার জীবনী।

(২) অল-ফারুক—খলিফা ওমরের বিস্তৃত জীবনী। ইহার ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে।

(৩) অলমামুন—খলিফা মামুন-উল-রসিদের জীবনী।

(৪) অল ঘজালি—বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ঘজালির জীবনী।

(৫) অল্ কালাম—ইস্লাম ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব।

(৬) ইলমুল কালাম—মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস।

(৭) সবনেব মৌলানা রাম—মৌলানা রামের জীবনী।

(৮) মাজামিন আলমগীর—ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

(৯) বাসাইল শিবলী—শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

(১০) মাকালত শিবলী—(২য় খণ্ড) তাঁহার স্বলিখিত প্রবন্ধ-সমূহের সমষ্টি।

(১১) সাকুনামা মিশ্র—তাঁহার ইজিপ্ট, তুরস্ক, এসিয়া মাইনর ও অন্যান্য স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী।

(১২) মাবাজনা আনীজ ও দবীর—উর্দ্দু ভাষার দুইজন বিখ্যাত লেখকের তুলনামূলক সমালোচনা।

(১৩) শিরুল আজাম—পার্শী কবিতার বিস্তৃত ইতিহাস। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

উপরোক্ত পুস্তকাবলী ছাড়া তিনি আরবী ভাষায় দুইটি

উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভাষা-সম্পদ ও প্রাঞ্জলতা এবং রসালতা পাঠকমাত্রকে তাঁহার লেখা পড়িতে প্রলুব্ধ করে। "শিরুল আজাম" পুস্তকের জন্য তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৫ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা-সমূহ বিবিধ দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের অনুশীলনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শুধু যে কেবল গদ্য লেখক ছিলেন তাহা নহে, কবিত্ব-শক্তিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। পারসী ভাষায় তিনি যে সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ জেলা আজমগড়ে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের নহবৎ-উল্-উলামা বিদ্যালয় পূর্ব্বে একটি সাধারণ আরবী স্কুল ছিল, এক্ষণে উহা সমৃদ্ধ স্কুলে পরিণত হইয়াছে। মৌলানা সাহেব ওয়াকফ্ আইনের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা মুসলমানমাত্রেরই বিশেষ উপকারে আসিয়াছে। রাজনীতিক বিষয়ে তিনি মিঃ গোখলের ন্যায় ধীরমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহাদের দাবী পরিপূরণ করিবার জন্য জিদ করিতে অনুরোধ করিতেন।

১৯১৪ সালের ১৮ই নভেম্বর মৌলানা শিবলী নোমানি ৫৭ বৎসর বয়সে মারা যান। ১৯১৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা মোসলেম ইন্‌ষ্টিটিউটে বিচারপতি সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, সেই সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় নিজাম গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয় যে, মৌলানা সাহেব জীবদ্দশায় নিজাম গভর্ণমেণ্ট হইতে যে টাকা বার্ষিক পাইতেন তাহা যেন প্রস্তাবিত ডর-উল-মুসানে-ফিন্ন রক্ষাকল্পে দেওয়া হয়।

ইহাও প্রস্তাবিত হয় যে, বাঙ্গালার মুসলমানেরা যেন শিক্ষা-বিস্তারের জন্ম বার্ষিক ৫ হাজার টাকা তাহার নামে ব্যয় করেন। ১৯১৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রে প্রকাশিত হয় :—The award of the Nobel prize to Dr. Tagore was an event of the very first importance from the standpoint of Indian vernacular literature. But another event, a very sad one indeed, of almost equal importance to that literature was the very recent death of the great Hali at Panipat. Round the late Sir Syed Ahmad Khan of Aligarh, there had grown up a brilliant ring of famous and great men. Among them were to be counted such towering personalities as Mohsin-ul-mulk Dr. Nasir Ahmad and Moulana Shibalu and others. These men were the pioneers of new thought in Islam and it was they who laid the foundation of the Aligarh College at a time when Indian Moslems lay buried under the "debries" of the defunct Mogul Empire.

অর্থাৎ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, ইহা যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি নিরানন্দের বিষয় এই যে, স্যর সৈয়দ আহম্মদের প্রিয় শিষ্য মৌলানা শিবলী পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনিও মুসলমানদের মধ্যে নূতন চিন্তাধারা প্রবেশ করাইয়াছেন। যাঁহারা আলিগড় কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন, ইনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহাদের পরিশ্রমের তুলনা নাই। মৌলানা শিবলীর উর্দ্দু গ্রন্থাবলী চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। দেশে এমন কোন মুসলমান আঞ্জুমান

বা কন্‌ফারেন্স ছিল না, যাহাতে তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ না করা হইত। তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু স্যর সৈয়দ আমেদের জীবনী লিখিয়াছিলেন।

স্যার আবদার রহিম

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার আবদার রহিম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী আবদুর রুব মেদিনীপুর জেলার একজন জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতামহ জমিদার ও ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই শিক্ষিত ছিলেন। মেদিনীপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলে আবদার রহিমের প্রাথমিক শিক্ষা হয় এবং তথা হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অনার লইয়া বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইংরাজী সাহিত্যে তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে প্রথম হইয়া "এম্ এ" পাশ করেন।

অতঃপর তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যান। ভুপালের মহামান্য বেগম সাহেবার প্রদত্ত বৈদেশিক বৃত্তি তিনি পাইতে থাকেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরের শেষে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি মুসলমান আইন ও ফৌজদারী এই উভয় আইন বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের মধ্যে তিনি কৃতবিদ্য ব্যবহারাজীব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন এবং সরকারের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হইল। তিনি ডেপুটী লিগাল রিমেম্ব্রান্সার নিযুক্ত হইলেন। দেড় বৎসরকাল তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হাইকোর্টের আপীল বিভাগে ফৌজদারী আইনে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। অতঃপর উত্তর কলিকাতায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। সচরাচর এই পদে

কোন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় না। ১৯০০—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "ঠাকুর ল লেক্‌চারার" নিযুক্ত করা হয়। তিনি মুসলমান আইন পড়াইতে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা মুসলমান আইনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চান, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুস্তকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় এবং তাঁহার উন্নতির পথ সুপরিষ্কৃত করে। কাজেই মান্দ্রাজ হাইকোর্টে একজন মুসলমান বিচার-পতির প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহাকেই উক্ত হাইকোর্টে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্যার আবদার রহিম মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং অল্প দিনের মধ্যে মান্দ্রাজে বিচক্ষণ বিচারক বলিয়া কৃতীত্ব লাভ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে মান্দ্রাজ হইতে চলিয়া যান, সেই সময়ে মান্দ্রাজের Weekly Notes লিখিয়াছিলেন—

Justice Rahim will not be with us in the High Court on its re-opening after the Christmas leave. He is drifted to a place of greater usefulness on the Public Service Commission. On the Bench he has earned a name for impartiality and independence of character and has maintained its high traditions. If occasionally he has exhibited a temper we have felt he was not responsible. On the whole, we are sorry we are losing even temporarily one of our ablest and most independent judges.

অর্থাৎ বিচারপতি রহিমকে বড়দিনের ছুটির পর আর আমরা দেখিতে

পাইব না। তাঁহাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কমিশনে সদস্য করিয়া অন্যত্র লওয়া হইয়াছে। বিচারপতিরূপে তিনি নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা বিচারক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাকে অল্পদিনের জন্য হারাইলেও আমরা তাঁহার অভাবে একজন সক্ষম ও স্বাধীনচেতা বিচার-পতি হারাইতেছি বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিলে ঐ Weekly Notes লিখেন—We are glad to welcome Mr. Justice Rahim back to his permanent place in our High Court. During his absence many changes in the personnel of the High Court have taken place. His Lordship is now the Senior Puisne Judge and his return is very opportune. There is great need of his independence now that even Sir C. Sankaran Nair has been taken away from our High Court."

অর্থাৎ বিচারপতি মিঃ রহিম মান্দ্রাজ হাইকোর্টে ফিরিয়া আসিয়া-ছেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহার অনুপস্থিত-কালে হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে অনেক রদ্ বদল হইয়াছে, এখন বিচারপতি রহিমই হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারপতি। স্যার সি, সঙ্করণ নায়ারকে আমাদের মধ্য হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কাজেই তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা বিচারপতির এখন বিশেষ প্রয়োজন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিচারপতি রহিম মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি প্রধান বিচারপতি হন। আশা করা গিয়াছিল যে, তিনি স্থায়ীভাবে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইবেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। যে কয়েক

মাস তিনি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং তিনি স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলে যে স্বচ্ছন্দে কার্য্য ভার পরিচালনা করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ অবস্থানকালে তিনি বিচারপতির কার্য্য ছাড়া আরও অনেক জনহিতকর কার্য্য করিতেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সদস্য ছিলেন। মান্দ্রাজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যগণের যে কন্‌ফারেন্স হয়, সেই কন্‌ফারেন্সের (উদ্ধৎ-উবস-উলেমা) তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে আসিবার পূর্ব্বে তিনি "মুসলমান লীগ" প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সিমলায় বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত যে নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন, তিনি সেই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মান্দ্রাজ মুসলমান শিক্ষা সমিতি ও আঞ্জুমানের ট্রাষ্টি ছিলেন। মান্দ্রাজ আজাম ও মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মুসলমান কলেজের তিনি দর্শকমণ্ডলীর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন; মান্দ্রাজ কস্‌মোপলিটান ক্লাবের তিনি সভাপতি ছিলেন।

ভারতের সমস্ত ক্ষেত্রে কি রাজনীতি, কি আইন, কি সাম্প্রদায়িক, কি সামাজিক, কি শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষেত্রেই স্যার আবদার রহিম প্রযত্ন লইয়া থাকেন। এদেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাইজার-ই-হিন্দ পদক প্রাপ্ত হন। সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি বলেন, I am one of

those who firmly believe that the connection of India with England is for the great benefit of both ; and I feel sure that the Imperial visit will strengthen that connection by bringing into play feelings of mutual respect and cordiality both between the English and the Indian on the one hand and between the different communities on the other."

অর্থাৎ আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ উভয় দেশের পক্ষেই হিতজনক। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, সম্রাটের ভারত আগমন উভয় জাতির মধ্যে বিশ্বাস ও সৌহার্দ্দ্য সৃষ্টি করিবে।

মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার কিছু পরেই তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন এবং ১৯১০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তাঁহাকে কন্‌ভোকেশন বক্তৃতা দিবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। সেই অভিভাষণে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথা বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ধর্ম্মহীন ছাত্র উৎপন্ন করিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্ম নাই একথা আদৌ সত্য নহে। দেশের বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় যে ধর্ম্মহীন, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন।

১৯১৫ সালে মিঃ আবদার রহিম পুনায় নিখিল ভারতীয় এংগ্লো ওরিয়েণ্টাল শিক্ষা কন্‌ফারেনেসর ঊনত্রিংশৎ অধিবেশনের সভাপতি হন। ১৯১৯ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন বক্তৃতা করেন এবং ছাত্রদিগের বৃত্তির পরিমাণ বাড়াইতে, দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে ও শিক্ষকগণের বেতন বাড়াইতে প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন— Effort must be made to giving equal chances of education to all communities and castes and not to allow the

educational opportunities to be monopolised by the most active and the forward ; অর্থাৎ সমস্ত সম্প্রদায় ও জাতিকে সমান-ভাবে লেখাপড়া শিখার সুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষা জিনিষটা যেন শুধু "উন্নত" জাতির জন্য একচেটিয়া না হয়।

মুডিম্যান কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে স্যার আবদার রহিম বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা বলেন। তিনি বলেন I venture also to assert that any step of a retrograde or reactionary tendency would be in direct opposition to unanimons Indian opinion and gravely intensify political difficulties" অর্থাৎ একথা আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, প্রতিক্রিয়ামূলক কোন কাজ করিলে তাহা ভারতের জনমতের বিরোধী হইবে।

তিনি মেষ্টনী বন্দোবস্তের সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন। ঐ কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠ কমিটির রিপোর্টে স্যার আবদার রহিমের মতামতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়। মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য হন, বর্ত্তমানে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি।

হিজ হাইনেস্ মাননীয় আগা খাঁ

হিজ হাইনেস্ স্যার সুলতান মহম্মদ শাহ্ বা বর্ত্তমান আগা খাঁ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের এক বিখ্যাত "সিয়া" পরিবারে তাঁহার জন্ম এবং "সৈয়দ" বলিয়া মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিগণিত।

মহামান্য আগা খাঁয়ের প্রপিতামহ আগা খালেতুল্লা খাঁ পারশ্যের রাজা ফতে আলি শাহের আমলে ইস্মাইল সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু ছিলেন। পারস্য রাজদরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি কার্ম্মাণের গভর্ণর ছিলেন। তাঁহার পুত্র আগা হুসেন আলিশাহ ধর্ম্মান্ধগণের হস্তে তাঁহার পিতা নিহত হইলে ধর্ম্মগদিতে উপবেশন করেন।

আগা হোসেন আলিশাহকে পারস্যরাজ মেলিটি ও কুম জেলার শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি খুব পরাক্রমশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং যতদিন ফতে আলিশাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন আগাও শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পারশ্যরাজ ফতে আলি মারা গেলে আগা হোসেনেরও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়। পারশ্য দেশ সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধের ও যুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া উঠে। তখন আগা নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না, তিনি মৃত রাজার পৌত্র মহম্মদ শাহের পক্ষাবলম্বন করেন এবং মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র জিলউস্ সুলতানের বিপক্ষতা গ্রহণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ শাহ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার সেনাদলের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং ফতে আলি শাহের একপুত্র তখনও কার্ম্মানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন।

আগা হুসেন তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আইসেন। পারস্ত দরবারে বন্দীকে উপস্থিত করা হইলে তাঁহার উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়া অবশেষে তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করা হয়। কিছুকাল যাবত আগা হুসেন আলির অবস্থা বেশ ভালই চলিতে থাকে। অবশেষে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ জটিল হইয়া উঠে যে, যে রাজাকে তিনি সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন, সেই রাজারই বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু এবার তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। অবশেষে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা আবারও এমন হইয়া উঠে যে, পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হয়। কিন্তু এবারও তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশায় জন্মভূমি ত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি তথায় যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার জন্য রাখিয়া আসিয়া নিজে আফ্গানিস্থানের ভিতর দিয়া সিন্ধুদেশে আগমন করেন। ইস্‌লামিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করে।

কিন্তু তিনি সামরিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করায় তিনি পুনরায় পারস্ত অভিযান করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসেন। তিনি সিন্ধুর আমীরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য স্যার চার্লস্ নেপিয়ারকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৯—৪০খ্রীষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা ভাতা (pension) ও বংশানুক্রমিক "হিজ হাইনেস্" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ে আইসেন, এইখানে তাঁহার খোজা শিষ্যগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। শেষ জীবনে তিনি কখনও বাঙ্গালোর এবং কখনও বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

মারা যান এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমান আগা খাঁয়ের পিতাও কবরে তাঁহার সহিত মিলিত হন।

বর্ত্তমান আগা খাঁ

পিতার মৃত্যু সময়ে বর্ত্তমান আগা খাঁয়ের বয়স মাত্র দশ বৎসর। তাঁহার মাতার যত্নে তিনি আরবী, ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহাকে পাশ্চাত্য ধরণে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনি ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বিশেষ আমোদ পাইতে থাকেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি "খোজা" সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বিশেস চেষ্টা করিতে থাকেন। রোমান ক্যাথালিকদের মধ্যে পোপের যে সম্মান, এই সিঞা সম্প্রদায়ভুক্ত খোজা উপাধিধারী মুসলমানদিগের মধ্যে আগা খাঁয়ের সম্মানও তদ্রূপ। কোন কোন খোজা তাঁহাকে সাক্ষাৎ খোদার অবতার (God incarnate) বলিয়া পূজাও করে। তাহারা তাঁহাকে তাঁহাদের আয়ের অংশ প্রদান করে। আগা খাঁ এই কারণে বহুটাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানে হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে আগা খাঁ নিজ খোজা সম্প্রদায়কে এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ দেখা দিলে তিনি খোজা সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু খোজা সম্প্রদায়েরই নেতা তাহা নহে ; মুসলমান মাত্রেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রৌপ্য জুবিলী উৎসব উপলক্ষে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মুসলমান কর্ত্তৃক সিমলা দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়া সুধী সমাজের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই। মহারাণী

ভিক্টোরিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দান করিতেন এবং উইণ্ডসর প্রাসাদে তাঁহাকে খাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বোম্বাইয়ে প্লেগের সময় নিঃস্বার্থ সেবা করার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে "কে সি আই ই" উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হন, এমন কি জার্ম্মানের ভূতপূর্ব্ব "কাইজার" পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

আগা খাঁয়ের এইরূপ অসামান্য প্রতিপত্তি দর্শনে বয়সে যুবক হইলেও আলিগড় স্কুলের নবাব মহসিন-উল্-মুলুক ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হয়। মহসিন-উল্-মুলুক অতি চতুর ছিলেন; স্যার সৈয়দ আহম্মদের পর তিনিই এম-এ-ও কলেজের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন কলেজের উন্নতি করিতে হইলে হিজ হাইনেস্ আগা খাঁয়ের ন্যায় লোকের সাহচর্য্য দরকার। তাই তিনি ১৯০৩ সালে দিল্লীতে যখন দরবার হয়, তখন তথায় মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেন। মহামান্য আগা খাঁকে কন্‌ফারেন্সের সভাপতি পদে বরণ করা হয়। লর্ড কিচেনার, বোম্বায়ের গভর্ণর লর্ড নর্থকোট প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সরকারী কর্ম্মচারী কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হন। সেই কন্‌ফারেন্সে মহামান্য আগা খাঁ যে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি বিশেষ বাগ্মিতা সহকারে মুসলমান সমাজের নিকট আবেদন করেন যে, সকলে আলস্য, ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া স্বসমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অগ্রসর হউন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পর্দ্দা প্রথারও তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি আলিগড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক কোটি টাকার জন্য আবেদন করেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বায়ে নিখিল ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, সেই কন্‌ফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতিরূপেও তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেন। যদিও তখনই তাঁহার আবেদনের কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা দিন দিন তাঁহার মনে বাড়িতে থাকে। অবশেষে ১৯১০ সালে তাঁহার নেতৃত্বে ৩০ লক্ষেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হয়!

ইহার পর তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। মুসলমানেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেখিয়া তিনি নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগ প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করেন। অবশেষে ঢাকা নগরীতে নবাব সলিমুল্লা লীগের প্রতিষ্ঠা করেন।

ঢাকা শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের পর নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর করাচীতে যে সভা হয়, সেই সভায় লীগের নিয়ম কানুন গঠিত হয় এবং মহামান্য আগা খাঁ উহার সভাপতি হন। সম্প্রতি তিনি ঐ লীগের সভাপতিত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহামান্য আগা খাঁয়ের কার্য্যতৎপরতায় মুসলমানেরা কাউন্সিলে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধিকার পাইয়াছেন। এইরূপ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দেশের পক্ষে কেহ কেহ অহিতকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার সভাপতি মহামান্য আগা খাঁ নিজ কার্য্যের দ্বারা উহা বিপরীত প্রমাণ করেন। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে মহামান্য আগা খাঁ, শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সরলভাবে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সমস্ত শাসন সংস্কার বর্জ্জন করা উচিত নহে। I am glad our demand has been recognised.” মহামান্য আগা খাঁ কখনও সাম্প্রদায়িক নন। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য সাধনের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। ১৯১১ সালে যখন এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমান কন্‌ফারেন্স হয়, সেই কন্‌ফারেন্সে হিন্দু-মুসলমানে একতা সাধনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, মালব্য প্রভৃতি

নেতৃগণ সেই কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য আগা খাঁ বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে হউক হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য ও মনোমালীন্য দূর হইবে। হিন্দু মুসলমান একই নৌকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছে, নৌকা ডুবিলে উভয়েই মরিবে। ইনি যে কেবল মুখে-মুখে হিন্দুমুসলমান একতার পক্ষপাতী তাহা নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দু সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কয়েকটি হিন্দু ইন্‌ষ্টিটিউসনে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেন, দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি ও হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

শুধু ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমানের কল্যাণের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেন নাই। পরন্তু দক্ষিণ ভারতে ও অন্যান্য উপনিবেশে যে সমস্ত ভারতবাসী বাস করে, তিনি তাহাদের উপর নির্য্যাতন ও অত্যাচার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার নির্য্যাতন দূরীকরণে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। উপনিবেশ সমূহে যাহাতে ভারতবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, সেজন্য তিনি ভারতে ও ইংলণ্ডে বক্তৃতার দ্বারা ও সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ভাগ ইংলণ্ডে ও উপনিবেশ সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া উপনিবেশ প্রবাসী ভারতীয়দিগের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের গোচরীভূত করিতে পারিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মধ্য পথাবলম্বী এবং মিঃ গোখেল, স্যার মেটা প্রভৃতির মতাবলম্বী।

মহামান্য আগা খাঁ বিশ্বাস করেন যে, ভারতে এক সময়ে না এক সময়ে স্বায়ত্ব শাসন আসিবে। তবে তাড়াতাড়ি এই স্বায়ত্ব শাসন লাভ হইতে পারে না। স্বায়ত্ব শাসনের পথ সহজ নহে।

মহামান্য আগা খাঁয়ের সহিত মহামতি গোখেলের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। ১৯১৬ সালে আগা খাঁ Gokhale's Testament on Post-

war reforms প্রকাশ করিলে চারিদিকে মহা হুলুস্থুল লাগিয়াছিল। আগা খাঁ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাভাবে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট্ তাঁহার কার্য্যের প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনেক উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি ১১টি তোপধ্বনি পাইবার অধিকারী হইয়াছেন এবং যাবজ্জীবনের জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একজন প্রথম শ্রেণীর সামন্ত রাজার সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় মহামান্য আগা খাঁ সমগ্র মুসলমান সমাজকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য আহ্বান করেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে যান।

ভারতের প্রতি ব্রিটিশ রাজশক্তির সুবিচার ও সততার প্রতি তাঁহার আস্থা ও সরল বিশ্বাস আছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেন। উহাতে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। বিগত যুদ্ধের সময় তিনি ইংলণ্ডের একটি সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় সুখের বিষয় ভারতে কোন সাম্প্রদায়িক গোলযোগ নাই। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও জার্ম্মাণীর রণক্ষেত্রে যে সমস্ত ভারতবাসী দেহত্যাগ করিবে, তাহা বৃথা যাইবে না। তাহাদের রক্ত-ধারার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও রাজশক্তির প্রতি সন্দেহ দূর হইবে। তিনি শাসন সংস্কার সম্বন্ধে নূতন মতামত প্রকাশ করেন এবং তিনি মণ্টেগু শাসন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ শাসন সংস্কারের দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতে যে দায়িত্বমূলক গভর্ণমেণ্টে প্রতিষ্ঠা হইবে, এই বিশ্বাসও করিতেন। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে আগা খাঁ একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন। তাঁহার মৌখিক সাক্ষ্যে তিনি শাসন সংস্কারের কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া-

ছিলেন, আমেরিকায় যেরূপ স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত, ভারতেও তদ্রূপ স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মহামান্য আগা খাঁ খেলাফতের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে ও ইংলণ্ডের যেখানে গিয়াছেন, সেইখানে শান্তি ও একতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটনের প্রাচ্য নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এষার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং মেসোপটেমিয়ার ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে যখন দেশ টলমল এবং উত্তেজিত, তখন তিনি স্বজাতীয়দের সকলকে শান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিলে তিনি তাহাতে বিশেষ দুঃখ বোধ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহামান্য আগা খাঁ বহুদিন পরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কি পাওয়ার আশা করা যায়, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কেনিয়ার সমস্যা এখন আমাদের সমক্ষে প্রধান সমস্যা। তিনি আরও বলেন, Personaly I think the immediate problem of India in England is the solving sympathitically of the problem of kenya and if a labour Government comes into power that is the problem they may take up first very seriously rather than the political questions of India. অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমার মত এই যে, ইংলণ্ডে এখন কেনিয়ার সমস্যাই প্রধান সমস্যা এবং শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে কেনিয়ার সমস্যা গ্রহণ করিবেন। শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এইরূপ আশা করি।

শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বদরুদ্দীন তায়েবাজী

বদরুদ্দীন তায়েবাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধনাঢ্য আরব দেশীয় বণিক ছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা তায়েবাজী ভাই মিঞা সাহেব উদারপন্থী মুসলমান ছিলেন এবং যদিও তখনকার মুসলমানদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা করা মহাদোষাবহ ব্যাপার ছিল, তথাচ তাঁহার ছয় পুত্রকেই ইংলণ্ড পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিন পুত্র সুজাউদ্দীন, সামসুদ্দীন ও নাজমুদ্দীন ব্যবসা করিতে থাকেন এবং হাভার ও মার্সেলিস পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রসারতা করেন। কনিষ্ঠ আমিরুদ্দীন কেবল পাশ্চাত্য দেশ বেড়াইয়া বেড়ান। অন্য ভ্রাতা কামরুদ্দীন ইংলণ্ডে সলিসিটর হন, তিনিই ইংলণ্ডে ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সলিসিটর। বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, আজিও সেই ব্যবসায় তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। এই জীবনীর নায়ক বদরুদ্দীন উর্দ্দু ও ফার্সী শিক্ষা করিবার পর এলফিনষ্টোন ইন্‌ষ্টিটিউসনে যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহাকে ফ্রান্সে চক্ষু চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। এক বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে গিয়া নিউবেরি হাই পার্ক কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু তিনি আর পড়িতে না পারিয়া বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি লণ্ডনে গিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই নবেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তিনিই

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার। শীঘ্রই তিনি বাগ্মিতা শক্তি, যুক্তিতর্কের প্রভাব, বক্তব্য বিষয় প্রকাশের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি নানা সংগুণে ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। দশ বৎসর যাবৎ তিনি নিবিষ্টচিত্তে ব্যারিষ্টারী করেন। এই সময়ের মধ্যে পরলোকগত স্যার মেটা, মিঃ তেলাঙ্গ ও মিঃ রাণাড়ে তাঁহাকে কতবার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি রাজী হন নাই। কিন্তু দশ বৎসর ব্যারিষ্টারী করিবার পর তিনি স্বসমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই সঙ্কল্পে দৃঢ় ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের আঞ্জুমান ইস্‌লামের সম্পাদক হন, তৎপর উহার সভাপতি হন। তাঁহার চেষ্টায় উক্ত সমিতি বোম্বাইয়ের মধ্যে অতীব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসনেরও সভাপতি হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যার মেটা, নারায়ণচন্দ্র চন্দ্রভারকর প্রভৃতির সঙ্গে যোগদান করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আমদানী শুল্কের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসাবাদ হইতে থাকে। তৎপর হইতে বহু সভাসমিতিতে তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন। তন্মধ্যে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইলবার্ট বিল প্রভৃতি বিল সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার রাজনীতি জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। এই সময়ে তিনি মিউনিসিপাল ও লোকাল বোর্ড বিল সম্পর্কে এরূপ সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন যে, গভর্ণর স্যার জেম্‌স্ ফার্গুসন বলেন যে, যদি তিনি কমন্স মহাসভায় এইরূপ বক্তৃতা করিতেন, তবে তাহা একাগ্রচিত্তে সকলে শুনিত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যে প্রথম জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি ও অধি-

বেশন হয়, তনি তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পরে যখন মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়, তখন মিঃ তায়েবাজীকেই সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। তিনি অতি সারগর্ভ অভিভাষণ দেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ তায়েবাজী বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হন। বিচারক হিসাবেও তিনি নিরপেক্ষ সুবিচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন

সমাজ সংস্কারের দিকে মিঃ তায়েবাজী যে কাজ করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি সর্ব্বপ্রথম আপন পরিবার হইতে পর্দ্দা প্রথা দূর করেন। নিজ কন্যাকে তিনি শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। আজ যে বোম্বাইয়ের মুসলমান মহিলাগণ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য তায়েবাজীর উদ্যমের নিকট তাঁহারা ঋণী। তিনি নিজে খেলোয়াড় না হইলেও সকল প্রকার ব্যায়ামের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। ইস্‌লাম ক্লাব ও ইস্‌লাম জিমখানার তিনি আরম্ভাবধি উহার অন্যতম সৃষ্টিকর্ত্তা ও সভাপতি ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর দোষের জন্য অনেকদিন যাবৎ তিনি অধিক পড়িতে অথবা লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার শ্রুতলিপি (Dictation) অনুসারে অন্য লোকে লিখিত ও তাঁহাকে পুস্তকাদি পড়িয়া শুনাইত।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায় তিনি মুসলমান সমাজ হইতে পর্দ্দা-প্রথা দূর ও স্বজাতীয় সমাজের অন্তর্ভূক্ত রমণীগণের উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তাব করেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চক্ষুরোগ আরোগ্যের জন্য ইংলণ্ডে যান। তাঁহার চক্ষুর পীড়াও অনেকটা আরোগ্য হয়। তিনি লণ্ডনের দুইটী সভায় বক্তৃতা করেন।

জুলাই মাসে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আলিগড় কলেজ এসোসিয়েসনের ভোজ সভায় যোগদান করেন। তিনি কলেজের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। আলিগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি স্বসমাজের সকলের নিকট আবেদন করেন। কে জানে, সেইই তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা। বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হন। কয়েকদিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে অতিবাহিত করেন। তিনি যে এত শীঘ্র চক্ষু মুদ্রিত করিবেন, তাহা কেহ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নাই। হঠাৎ পূর্ব্বে কোনরূপ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত না করিয়াই তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার এই প্রকার আকৃতি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ছিল যে, যে কেহ তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহাকে ভক্তিমিশ্রিত ভয় না করিয়া পারিত না।

মুসলমান কন্‌ফারেন্সে তিনি পর্দ্দা প্রথার উচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব করায় বহু গোঁড়া মুসলমান তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁহার জীবননাশ পর্য্যন্ত করিবার সঙ্কল্প করে। তাহারা ইহাও স্থির করে যে, পরদিন যখন তিনি কন্‌ফারেন্সে আসিবেন, তখন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কেহ দাঁড়াইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, পরদিন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে এক সঙ্গে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রতিপক্ষের কেহ তাঁহার যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে একটি কথা পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করেন না। লর্ড রিয়ে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—If there is one man I admire in India it is Bed-rued-din." মহামান্য আগা খাঁ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্যার মেটার শোকসভায় বলিয়াছিলেন—Nothing finer or better could be imagined for a young Indian Patriot than to take to heart and carefully study the life-long principles and

practice of India's greatest and sounded sons, each an example and inspiration to all this countrymen and to his own community as well—Metha, Gokhale and Badaruddin Taybaji.

স্যার এম্ এ এন্ হায়দারী

স্যার মহম্মদ আকবর নাজারালি হায়দারী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বোম্বাই সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পরোপকার বৃত্তিতে জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আরব দেশে বাস করিতেন এবং ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহারা বোম্বাই আগমন করেন। তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী, সরল চেতা ব্যবসায়ী মুসলমান ছিলেন। ইউরোপের ও অন্যান্য বিদেশভূমির সহিত তাঁহাদের ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পরও তাঁহারা আরবের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মিঃ হায়দারীর প্রমাতামহ তাঁহার পুত্রগণকে বিদেশে বিদ্যা শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই পুত্রেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। মিঃ হায়দারীর পিতা ব্যবসায়সূত্রে ছয়বার চীন দেশে গিয়াছিলেন এবং তিনি চীনে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মিঃ হায়দায়ী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এবং মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে অনার্স লইয়া বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজেই তিনি প্রধানতঃ পাঠ করেন। উক্ত কলেজের পাদরীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ত্যাগ ও সরলতা শিক্ষা করেন। স্কুলে বাল্যাবস্থা হইতেই মিঃ হায়দারী স্বদেশহিতৈষণাগুণে বিভূষিত হন। ভারতকে তিনি বাল্যাবস্থা হইতে "জননী জন্মভূমি" বলিয়া পূজা করিতে শিখেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সভা সমিতিতে এবং রাজনৈতিক বিতর্কে যোগদান করিতেন। হার্ব্বার্ট স্পেনসারের পুস্তকসমূহ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার খুল্লতাত বিচারপতি তায়েবাজী ও হাজি নাজামুদ্দীন তায়াবাজী তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে মিঃ হায়দারী ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহাকে নাগপুর, লাহোর, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মান্দ্রাজে নিযুক্ত করা হয়। যেখানেই তিনি স্থানান্তরিত হইতেন, সেইখানেই তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট প্রেস একাউণ্টের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন এবং এই কার্য্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হন। তিনি গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিংএর ব্যয় সম্বন্ধে ও আসবাদাদি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করেন এবং যে নূতন প্রণালী দেখাইয়া দেন, আজিও সেই প্রণালী অনুসারে কাজ হইতেছে। তাঁহার রিপোর্টের ফলে গভর্ণমেণ্ট ষ্টেশনারী বিষয়ে একজন কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করেন। কর্ম্ম সূত্রে নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বহু লোকের সহিত পরিচিত হন এবং দেশে ঘোরতর অশিক্ষা দেখিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। স্বর্গীয় মিঃ গোখেল তাঁহাকে ভারত-ভৃত্য-সমিতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মহামান্য নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ রাজ্যে নিয়োজিত করেন বলিয়া তিনি গোখেলের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে পারেন না। নিজাম রাজ্যে গিয়া তিনি চিত্রাঙ্কণে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ্ হইলেও কেবল টাকা পয়সা দ্বারা যে জাতি গঠিত হয়, ইহা তাঁহার বিশ্বাস নহে। শিল্পই জাতির প্রাণ এবং জাতির রত্ন। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি হায়দ্রাবাদে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অনেক উন্নতি করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে তিনি একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হইয়া যান। তখন মিঃ (পরে স্যার) জর্জ্জ সেলুন ওয়াকার হায়দ্রাবাদের অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং মিঃ হাইদারীকে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি গিয়া তথাকার

অর্থনীতি বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ফাইনানসিয়াল সেক্রেটারী হন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তিনি ষ্টেটের সমগ্র অর্থ বিভাগের ভার গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন।

দুর্ভিক্ষের জন্য গচ্ছিত ফণ্ড, শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা নিয়োগ, মবুবিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি, হায়দ্রাবাদ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ইন্‌ষ্টিটিউসন, বন্যা সংশোধন প্রণালী এবং নগরের উন্নতিসাধন কার্য্য— সমস্তই মিঃ হায়দারীর নিঃস্বার্থ কার্য্য। মিঃ হায়দারী বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন—It remains to mention briefly what results the financial department have to show for their past year's work, in which Mr. A. Hydari of the Indian Finance Department has taken a prominent and effective part for the past five years as Accountant General and then as Finance Secretary. The expenditure has certainly, been brought under more effective control so far as local conditions permit and the Finance Department is now, generally, allowed its say in such matters of administration as obviously concern it." অর্থাৎ গত পাঁচ বৎসর যাবৎ অর্থনীতি বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া মিঃ হায়দারী এই বিভাগের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা বলা প্রয়োজন। অযথা ব্যয় অনেক হ্রাস এবং রাজ্যের আর্থিক অববস্থাও ভাল হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিঃ হায়দারীকে নিজাম বাহাদুর স্বরাষ্ট্র বিভাগে বিচার, পুলিশ ও সাধারণ বিভাগের ভার লইবার জন্য নিযুক্ত করেন। বিচার বিভাগে তিনি মামলা মোকদ্দমার সত্বর বিচার করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহারই সময়ে হাইকোর্টের সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। চিকিৎসা

বিভাগের পুনঃ সংস্কার, ডাক্তারগণকে উৎসাহ প্রদান, ডিচপল্লীর কুষ্ঠাশ্রমে সাহায্য দান, প্লেগনিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ, স্থায়ী স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ইউনানি চিকিৎসা বিভাগের উন্নতি তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার ফল। তবে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা বিভাগেই তিনি অধিক কাজ করিয়াছেন। মিঃ হায়দারী শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী হইবার পূর্ব্বে নিজাম রাজ্যে শিক্ষার জন্য সরকারী দান ছিল দশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী, এখন উহা ৭২ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদে ৯ শত স্কুল ও ৬০ হাজার ছাত্র ছিল, এক্ষণে উহার সংখ্যা হইয়াছে, যথাক্রমে ৪১০০ ও ২৫০,০০০। কিন্তু ইহাই মিঃ হায়দারীর সমস্ত কাজ নহে। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ট্রানশ্লেসন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মাতৃভাষাকেই উচ্চ শিক্ষার সোপান করিয়াছিলেন। সমস্ত পাঠ্য পুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করাই তাঁহার ট্রানশ্লেসন ব্যুরোর কাজ ছিল। অনেকের বিশ্বাস এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার বিরোধী, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা নহে। ভারতীয় নীতিতে শিক্ষা দানই ইহার উদ্দেশ্য। ভারতের গ্রামে গ্রামে শিক্ষার আলোক বিস্তার করা এবং দ্বিতীয়তঃ মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা দেওয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। মিঃ হায়দারী হিন্দু মুসলমানে একতার বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কলেজ হোষ্টেল সমূহই একতার কেন্দ্র। সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান ছাত্রদিগকে তথায় পড়িবার সুযোগ দিতে নারাজ হইলে তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি East and West পত্রে সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মিঃ হায়দারী আলিগড় এম্ এ ও কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি আছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কলেজ পরিদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

মিঃ হায়দারী শিক্ষার সহিত রাজনীতি মিশ্রণের পক্ষপাতী নহেন। রাজনীতির সহিত শিক্ষা সংমিশ্রণের বিরোধী বলিয়াছি এই কারণে যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় আলি ভাইয়েরা যখন আলিগড় কলেজ অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে বাধা দিয়াছিলেন। মিঃ হায়দারী শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও যে কত কাজ করিতেছেন, তাহা তাঁহার জীবদ্দশায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

মিঃ হায়দারী চাকুরী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। হিন্দু মুসলমানে একতা না হইলে দেশের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, ইহাই তাঁহার অভিমত :—

I can conceive no other work to which an Indian can consecrate himself than that of cementing of our vast continent into a solid and united whole. অর্থাৎ জাতির পরস্পর সম্মেলন ছাড়া আমাদের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রচারে তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীই সর্ব্বপ্রথমে পর্দ্দা দূরে ফেলিয়া দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর কাইজার-ই-হিন্দ মেডাল পান। তিনি পরে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন ; ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিভি কাউন্সিলার উপাধি পাইয়াছেন।

স্যার আলি ইমাম

লর্ড সিংহের স্থলে স্যার আলি ইমাম বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হন এবং পরে মহামান্য নিজাম কর্ত্তৃক তাঁহার শাসন পরিষদের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। স্যার আলি ইমাম পাটনার নিকট নেওরা গ্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের বংশধর, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আগমন করেন। তাঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ মাল্লাসায়াদ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। মাল্লাসায়াদের পুত্র নবাব সৈয়দ খাঁ সম্রাটের উজির হইয়াছিলেন। তাঁহার আর একজন উত্তর পুরুষ নবাব মীর আস্কারী বাঙ্গালার নবাবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। স্যার আলি ইমামের প্রপিতামহ খাঁ বাহাদুর সৈয়দ ইমদাদ আলি পাটনার সবজজ ছিলেন; তাঁহার পুত্র খাঁ বাহাদুর শাম-শুল উলেমা সৈয়দ ওয়াউদ্দীন সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয়দিগের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সেসন জজ হইয়াছিলেন। স্যার আলি ইমামের পিতা সাম-শুল-উলেমা নবাব সৈয়দ ইমদাদ ইমাম কিছু কাল পাটনা কলেজের ইতিহাস ও আরবী শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি উর্দ্দু কবিরূপে বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা ও পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিঃ সরফুদ্দীন স্যার আলি ইমামের মাতুল। স্যার আলি ইমামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ হাসান ইমাম। হাসান ইমাম কিছু দিন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং ১৯১৮ সালের বিশেষ কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হন।

আলি ইমাম আরা জিলা স্কুলে ও পরে পাটনা কলেজে শিক্ষা লাভ

করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে জাতীয় মহাসভার যে প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, সেই প্রতিনিধিদলকে আলি ইমাম ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া স্যার আলি ইমাম ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব হইয়া উঠেন। তাঁহাকে হাইকোর্টের জজীয়তী লইবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হইলেও, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯০৯ সালে তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল হন।

জনহিতকর কাজ

৬বৎসর কাল তিনি পাটনা জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য ছিলেন এবং ৬ মাস কাল অস্থায়ীভাবে মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। ১৯০৩ সালে তিনি আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টি হন। স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আলিগড় কলেজে তিনি বহু টাকা দান করিয়াছেন এবং মুসলমান শিক্ষা কন্ফারেন্সের জন্যও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। ১৯০৮ সালে তিনি বেহার প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হন। কমিশনারদের কন্ফারেন্সে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করিবার জন্য স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রকাশ করায় আপামর সাধারণ তাঁহার কার্য্যে প্রীতি প্রকাশ করে।

১৯১০ সালে তিনি মুসলমান লীগের অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতি

নির্ব্বাচিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে স্যার আলি ইমাম উদার নীতিক ছিলেন। ক্যাম্ব্রিজের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—Governnent of the people, by the people, for the people, was a very natural adjunct to Goverment by the British". ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া স্বরাজ লাভই স্যার আলি ইমামের আদর্শ ছিল। "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে" তিনি মিঃ গোখেলে কর্ত্তৃক পরিচিত হইবার পর বলিয়াছিলেন—Mahamedans ought to recognize that they should be Indians first and Mahamedans afterwards and Hiudus that they should be Indians first and Hindus afterwards. অর্থাৎ মুসলমানেরা মনে রাখিবেন যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসী, তৎপর মুসলমান, হিন্দুরাও মনে রাখিবেন যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী তৎপর হিন্দু।

১৯১৯ সালে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থে যে ভোজ হয়, সেই ভোজ সভায় তিনি ঐপ্রকার বক্তৃতা করেন। স্যার আলি ইমাম শাসন পরিষদের সদস্যরূপে যে কৃতীত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৫ সালে কাউনিসল চেম্বারে এক বক্তৃতা করিয়া তাহা স্বীকার করেন।

১৯১৭ সালে স্যার আলি ইমাম পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে তিনিই পাটনা হাইকোর্টের প্রথম জজ হন। ১৯১৯ সালের জুন মাসে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর একটি শাসন পরিষদ গঠন করিবার অভিলাষ করেন এবং স্যার আলি ইমামকে প্রথম সভাপতি নিযুক্ত করেন। স্যার আলি ইমাম তাঁহার অভিজ্ঞতার দ্বারা নবগঠিত কাউনিসলকে আদর্শ কাউন্সিলে পরিণত করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে বড়লাট স্যার আলি ইমামকে জাতিসঙ্ঘে (League of nations) তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে পাঠান। জাতিসঙ্ঘ হইতে ফিরিয়া

আসিয়া তিনি পুনরায় .নিজামের কার্য্য যোগদান করেন বটে, কিন্তু ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অকস্মাৎ উক্ত পদে ইস্তফা দেন। তিনি পদত্যাগ করিয়া আসিয়া পাটনা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই মহামান্য নিজাম বাহাদুর বেরার রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্যার আলি ইমামের সহায়তা গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সাল হইতে বেরার রাজ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আলি ইমামকে মন্ত্রী সভার নিকট নিজামের দাবী উপস্থিত করিবার জন্য পাঠান হয়। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রী সভার প্রধান প্রধান সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র তাঁহার চেষ্টায় বেরার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। রাইট অনারেবল শাস্ত্রী মহাশয় কেনিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্যার আলি ইমাম তাঁহাকে ও অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে হোটেল সিসিলে অভ্যর্থনা করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্যার আলি ইমাম ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভারত শাসন সংস্কার সংশোধনের জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে দায়ীত্ব (নৌ, সামরিক ও রাজনীতি বিভাগ ব্যতীত) দিতে হইবে। তিনি বলেন, ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিগণ যদি বড় বড় বাজে কথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্ত ভুল করিবেন। এক সময় ছিল, যখন ভারতবাসী ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বড় বড় কথায় মুগ্ধ হইত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এইরূপ ছিল :—

"English education has given Indians a common language, common aspirations and a common patriotism.

and it was possible for the Muhamedans and the Hindus to work together for the development of India united among themselves and united to Britain."

অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা ভারতবাসীকে সাধারণ ভাষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়াছে। ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একত্রিত হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।

স্যার মহম্মদ সফী

মিঞা স্যার মহম্মদ সফী লাহোর জেলার অন্তঃপাতী বাঘবনপুরার মিঞা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের বিস্তৃত জমিদারী লাহোর মণ্টেগোমারি, সেখুপুরা, লায়ালপুর, মজঃফরগড়, ডেরাইসমাইল খাঁ, সিমলা ও দিল্লীতে ছিল। ভাওলপুর রাজ্যেও তাঁহাদের জমিদারী ছিল।

মিঞা মহম্মদ সফী পরলোকগত মিঞা দীন মহম্মদের একমাত্র পুত্র। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহাকে স্থানীয় একটি মস্‌জিদে রাখিয়া কোরাণ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিখান হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর সেণ্ট্রাল মডেল স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়া লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে তিনি ফর্ম্মাণ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন এবং তথায় দেড় বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। লাহোরে ছাত্রাবস্থাতেই তিন Pioneer, Civil and Military Gazette, Tribune, Punjab Patriot ও Muslim Herald প্রভৃতি পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইংলণ্ডে যাইবার দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার তাঁহার পিতৃব্য বিচারপতি শাহ দীনের সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তথায় আঞ্জুমান-ই ইস্‌লামিয়া (লণ্ডন) প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রাথমিক সভায় মিঞা মহম্মদ সফী ইস্‌লামের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে আবদার রহিম, শাহদীন ও আলি ইমাম ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। মিঞা মহম্মদ সফী উহার সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্টজেম্‌স্ প্রাসাদে রাজকীয় লেভীতে তিনি আমন্ত্রিত হন। অতঃপর তিনি International ও constitutional law ও

constitutionl historyর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান ক্লাবের হাউস্ কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন এবং রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের ভারতীয় বিভাগে তিনি বক্তৃতা করিতেন। ইহা ছাড়া National Indian Assosiation, Society for the encouragement and protection of Indian arts এবং Indian temperence associtionএ বক্তৃতা করিতেন। তিনি কেবল বই পড়িয়া ব্রিটিশ রাজনীতি শিক্ষা করিতেন না, পরন্তু কমন্স সভার অধিবেশনে তিনি ঘন ঘন যোগদান করিতেন এবং লণ্ডনে যত রাজনৈতিক সভা হইত তাহাতেও যোগদান করিতেন। লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াই তিনি প্যাডিংটন পার্লামেণ্টে যোগদান করেন, এই পার্লামেণ্টে অনেক পার্লামেণ্টের সদস্য, ব্যারিষ্টার, সলিসিটর, ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ সদস্য ছিল। এক বৎসরের অধিক কাল তিনি উক্ত পার্লামেণ্টের ইউনয়নিষ্ট ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কয়েকটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন এবং ঐ বৎসরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইংলণ্ডে থাকিয়া নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগদান করার ফল তাঁহার বৃথা হয় নাই। তিনি ভারতে আসিয়াও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার কার্য্যতৎপরতার বিষয় সকলেই জানেন। তিনি সম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন নহেন। অনেক অ-মুসলমান ইন্‌ষ্টিটিউসনে সাহায্য করিয়া তিনি অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমে তিনি লাহোরের অন্তর্গত হোসিয়ারপুরে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি Punjab Tenancy act 1887 এর টীকা

প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি হোসিয়ারপুর জেলা কোর্টের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারের আসন অলঙ্কৃত করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি Provincial Small Causes Courts Act" এর টীকা টিপ্পনীসমেত একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে আসিয়া চীফ কোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব চীফকোর্ট বার এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। তাহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি "The law of compensation for improvements in british India" নামক মৌলিক গ্রন্থ লেখেন। এই সময়ে ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার এরূপ পশার প্রতিপত্তি হইয়াছে যে, গ্রন্থ লেখার কাজ করিবার আর তাঁহার অবকাশ মিলিতেছিল না। ১৯০৭ সালের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব চীফ কোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব হন। ১৯০৮ সালে তিনি "খাঁ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিষয়েই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছিলেন। সকলে তাঁহাকে Punjab Customary law এর প্রামাণিক বলিয়া মনে করিত। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ আবদার রহিম (পরে স্যার) রয়াল কমিশনের সদস্য হইলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে উক্ত পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এই সময়ে ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার প্রভূত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং জনসমাজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রয়াল কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহুত হইলে তিনি উকিল ব্যরিষ্টারগণকে যথাযোগ্য অংশে বিচারবিভাগে লইবার জন্য বলেন। মিঃ লাল চাঁদ পাঞ্জাব চীফ কোর্টের বিচারপতি হইলে তিনি পাঞ্জাব চীফ কোর্ট বার এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পাঞ্জাব বার কাউন্সিলেরও তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৬ সালের মধ্যে তিনি পঞ্জাব চীফ কোর্টের সর্ব্ববাদী-

সম্মত নেতা হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীফ কোর্ট বার এসো-সিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং শাসন-পরিষদের সদস্য না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে তিনিই প্রথমে শাসন-পরিষদের সদস্য হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃব্য বিচারপতি শাহদীনের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের জজিয়তী গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়; তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ খ্রীষ্টাব্দে স্যার শঙ্করণ নায়ার ভারত গভর্ণ-মেণ্টের শিক্ষা সচিবের পদত্যাগ করিলে মিঞা মহম্মদ সফীকে উক্ত পদ প্রদান করা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ভারত সরকারের আইন সচিবের পদপ্রাপ্ত হন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিঞা মহম্মদ সফী যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ভারতে মুসলমানদের কোন সঙ্ঘবদ্ধ সমিতি ছিল না। কেবলমাত্র মিঃ সৈয়দ মামুদ প্রতিষ্ঠিত Anglo Mahamedan Defence Association ছিল; কিন্তু উহার কাজ ছিল, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পাঠাইয়া মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। হোসিয়ারপুরে মিঞা মহম্মদ সফী স্থানীয় আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি উহার অনারারি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি যুবক মুসলমান সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঐ সময়ে উত্তর ভারতে মুসলমানদের কোন স্বতন্ত্র সংবাদপত্র ছিল না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঞা মহম্মদের চেষ্টায় লাহোরে একটি সমিতি গঠিত এবং Observer পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র ভারতীয় মুসলমানদের জাগরণের পক্ষে অনেক সাহায্য করিয়াছে। মিঞা মহম্মদ সফী উক্ত কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড এলগিন সিমলায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রৌপ্য জুবিলী উৎসব করিলে মিঞা

মহম্মদ সফী পাঞ্জাবের মুসলমানগণের প্রতিনিধিস্বরূপ উহাতে যোগদান করেন এবং বড়লাটের নিকট তাঁহাদের সম্ভাষণ উপস্থিত করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মিঞা মহম্মদ সফী Observer পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া মুসলমানদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত সমিতির নাম Indian Muslim League রাখিবার প্রস্তাব তিনি করেন। ফলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলমান লীগের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মিঞা মহম্মদ সফী উহার সেক্রেটারী হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদ ও নিখিল ভারত মুসলমান লীগের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব জেলা লীগসমূহ গঠিত হইয়াছিল। মিঞা মহম্মদ সফী ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে কখনও যোগদান করেন নাই। মণ্টেগু শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে জাতীয় মহাসমিতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উদারনৈতিক অথবা মধ্যপন্থীগণ শাসনসংস্কারকে দায়ীত্বমূলক শাসনলাভের সোপানরূপে গ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে চরমপন্থীগণ শাসনসংস্কারকে একেবারে বর্জ্জন করেন। মিঞা মহম্মদ সফী বোম্বাইয়ের মডারেট কন্‌ফারেন্সে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তার করিয়া শাসনসংস্কারে তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের একজন সদস্যও নির্ব্বাচিত হন। তদবধি তিনি দেশের উদারনৈতিক দলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। তিনি Civil ও Military Gazetteএ ১৪টী প্রবন্ধ লিখিয়া মণ্টেগু শাসনসংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করেন। লর্ড সাউথবরোর সভাপতিত্বে যখন ফ্রাঞ্চাইজ্ কমিটীর অধিবেশন দিল্লীতে বসে, তখন মিঞা মহম্মদ সফী উহার বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাবের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পঞ্জাব ব্যবস্থাপক

সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হন। তখনকার দিনে কেবল পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় তিনজন বে-সরকারী সদস্য ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণই ঐ শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল। পঞ্জাবের ছোটলাট স্যার লুইডেন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হইবার জন্য মিঞা মহম্মদ সফীকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তখন কলিকাতায় ভারতীয় রাজধানী থাকায় তিনি সে মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, তিনি পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় পুনরায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

মিঞা মহম্মদ সফী প্রথম জীবন হইতেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। হোসিয়ারপুরে অবস্থানকালে তিনি একটি মুসলমান হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব লাট কর্ত্তৃক পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, অতঃপর লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভার্সিটী এক্ট পাশ হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি উর্দ্দু ভাষাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার জন্য বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণার নিখিল ভারত উর্দ্দু কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ভারতের যেখানে যত মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যও তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট।

সরকারী কার্য্য

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মিঞা মহম্মদ সফী ভারত-সরকারের শিক্ষা সচিব হন। তাঁহার উপর শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতির ভারার্পিত হয়, ইহার উপর কিছুদিনের জন্য তিনি কমার্স ইণ্ডাষ্ট্রীরও ভার গ্রহণ করেন। তার পর স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু অবসর গ্রহণ করিলে তিনি আইন সচিব হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হন; ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষা সচিবরূপে তিনি স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে ঢাকা, রেঙ্গুণ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা ও ছাত্রাবাস-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching and Residential Universities) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডি লিট (Doctor of Literature) এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ডি এল (Doctor of Law) উপাধি প্রদান করেন। বড়লাট তাঁহাকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোচ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। সাড়ে তিন বৎসরকাল তিনি শিক্ষা-সচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তাঁহার চেষ্টার পরিসীমা ছিল না।

মিঞা মহম্মদ সফী রাউলাট এক্টের বিরোধী ছিলেন এবং অমৃতসর হাঙ্গামার পর তিনি স্যার মাইকেল ও'ডায়ারকে দমননীতি পরিহার করিয়া সহযোগিতামূলক নীতি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হন এবং ৫ মাস পরে পঞ্জাব হাঙ্গামায় দণ্ডিত সকল আসামীকে মুক্তিদান করা হয়। হাণ্টার কমিটি যখন পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের

তদন্ত করেন, তখন তিনি শাসন-পরিষদের সদস্য হইলেও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করেন যে, পঞ্জাবে কোন বিদ্রোহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর লর্ড রেডিং বিদায়ভোজে বলেন ;—

During the time when there was considerable agitation among the Mussalmans in India regarding the affairs in the Near East, I was fortunate in having as my adviser Sir Mahammad, who was specially equipped to keep me informed of the feelings and views of his co-religionists. I refere to the period when there were doubts and difficulties in the minds of Indian Mussalmans regarding the situation with Turkey and the Treaty of Saveres. Sir Mahammad was of the greatest and most valuable asistance to me during that difficult period and I may also say, to the community of which he is so distinguished a member.

অর্থাৎ তুরস্ক ও সেভার্স সন্ধি লইয়া যখন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তখন স্যার মহম্মদ সফী সর্ব্বদা ইঁহার স্বজাতীয়গণের মনোভাব আমাকে বলিয়া সেই কঠিন সময়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

তিনি নানা সাব কমিটীতে বসিতেন এবং স্যার উইলিয়ম ভিন্সেণ্টের সহিত সীমান্ত ও ওয়াজিরিস্থান তদন্তে গিয়াছিলেন। Indian Soldiers' Boardএর তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক ব্যয় ৭২॥ কোটি টাকা স্থলে ৬০ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

কাউন্সিল অব ষ্টেটের নেতারূপেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া-

ছিলেন। স্যার মহম্মদ সাড়ে পাঁচ বৎসর চাকুরী করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লী ও কলিকাতায় তাঁহার বিদায়ভোজে সর্ব্বশ্রেণীর সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লাহোর ও অমৃতসহরে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সি, আই, ই ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কে, সি, এস, আই উপাধি দেওয়া হয়।

সৈয়দ আবদুল আজিজ

বিহার গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সচিব ব্যারিষ্টার সৈয়দ আবদুল আজিজ পাটনা জেলার মুরা গ্রামের ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিহার ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তিনি ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের অসুবিধার বিষয়ে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা করিতেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহাতে ইউ-রোপের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া অতি অল্প দিনেই পশার করেন। তিনি টিকারী রাজার মামলা, শোঘরা ট্রাষ্ট মামলা প্রভৃতি বড় বড় মামলা করিয়াছেন। স্যার আলি ইমামের মৃত্যুর পর বিহার প্রদেশে ফৌজদারী মামলায় তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি অনেক রাজনৈতিক ও বিদ্রোহাত্মক মামলায় দাঁড়াইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তন্মধ্যে দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলাই সমধিক প্রসিদ্ধ।

রাজনীতিতে সময়ক্ষেপ করিবার মত তাঁহার অবসর না থাকিলেও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা বিভাগের মুসলমানগণের পীড়াপীড়িতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহার সদস্য আছেন। তাঁহার স্বজাতীয়গণ তাঁহার প্রতি এত দূর শ্রদ্ধা ভক্তি পোষণ করে যে, তিনি দুই দুইবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় "অড়হর" নামে যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় আছে, তিনি তাহা-

দের অবিসম্বাদী নেতা। বিহারের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত আছেন। হিন্দু মুসলমানে মিলনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় যে "ঐক্য সম্মেলন" হয়, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেও লক্ষ্ণৌএ যে ঐক্য সম্মেলন হয়, তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহাকে শিক্ষা-সচিব পদে নিযুক্ত করা হইলে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার বাটীতে সমবেত হইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিঃ জিন্নার স্থান অতি উচ্চে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে করাচী নগরে এক ধনী খোজা ব্যবসায়ী পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে ও বাল্যে তিনি বিলাসিতার মধ্যে প্রতি-পালিত হইলেও তিনি পড়াশুনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ধনীর সন্তান হইলে বিলাসব্যসনেই সাধারণতঃ অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু মিঃ জিন্না অন্য প্রকৃতির ছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই জন্মভূমি ও নিজ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জিন্না ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যান। তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসরও পরিপূর্ণ হয় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে মহামতি দাদাভাই নৌরাজির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাব জীবনে রাজনীতির ছায়াপাত হয়। ইংলণ্ডে তিনি যে ৫।৬ বৎসর ছিলেন, সেই কয়েক বৎসর তিনি ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণের জন্য সতত চেষ্টা করিতেন।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি দেখিতে পান যে, অর্থাভাবে তাঁহার পরিবার বর্গ বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন এবং সংসারের সে স্বচ্ছলতা আর নাই। কাজেই এই নবীন যুবক ব্যারিষ্টারকে প্রথম কয়েক বৎসর বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল; কিন্তু আপন অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারীতে পসার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের এডভোকেট হন। বর্ত্তমানে বোম্বাই হাইকোর্টের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার। পুরাতন ভারতীয়

ব্যবস্থাপক সভা ও নূতন ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ জিন্নার বক্তৃতায় তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা, স্বজাতিপ্রীতি ও প্রগাঢ় আইন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পারসী ব্যবসায়ী স্যার দিনশা পেটিটের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। "খোজা সম্প্রদায় জাতিতে হিন্দু, কিন্তু ধর্ম্মে মুসলমান" বলিয়া এইরূপ বিবাহ মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী হয় নাই।

মুসলমান সমাজ তাঁহাকে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে, তিনি বরাবর মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা বিল সমর্থন প্রসঙ্গে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে স্যার হার্কোট বাটলারের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়।

মিঃ জিন্না সন্ত্রাসবাদ, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে। তাই ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি ফৌজদারী সংশোধিত আইন ও মুদ্রাযন্ত্র আইনের সমর্থন করিয়া বলেন, "গভর্ণমেণ্টের আইন ও শৃঙ্খলা নষ্ট যাহারা করে, তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। মুদ্রাযন্ত্র আইন সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই আইনে সংবাদপত্রকে দমন করা হইবে, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইবে, ইহা জানিয়াও কেবল দেশে যে প্রকার রাজনৈতিক অপরাধ হইতেছে, তাহা দমন করিবার জন্য এই আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করিতেছি। যে সমস্ত পথভ্রষ্ট যুবকেরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, ঐ প্রকার ষড়যন্ত্রের দ্বারা কোন দেশ কোনকালেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই।

কংগ্রেসে মিঃ জিন্না বরাবরই যোগদান করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি দাদাভাই নৌরাজির সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয়, মিঃ জিন্না তাহাতে "ওয়াকফ" বিল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উহাই

তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। মুসলমান লীগ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ দেখিয়া মিঃ জিন্না লীগে যোগদান করেন না। কেবল বিশেষ অনুরোধে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসম্মেলনে যোগদান করেন। লীগ হইতে তিনি দূরে থাকিলেও মুসলমান জাতিদের উন্নতি হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও উদারতার বিকাশ হয়, ইহা তিনি মনে প্রাণে প্রার্থনা করিতেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থাকে সভায় Wakf Validating Bill উপস্থাপিত করেন এবং উহা আইনে পরিণত হয়। অতঃপর মোস্লেম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জিন্না গোখেলের সহিত ইংলণ্ডে যান এবং তথায় গিয়া London Indian Association প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ গোখেলের মৃত্যু হইলে মিঃ জিন্না বোম্বাই প্রদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে আরও উচ্চাসন লাভ করেন। তাঁহাকে "ভারতীয় মোশ্লেম লীগের সভাপতি" পদে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লীগের অধিবেশন হয়। আমেদাবাদে বোম্বাই প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি পদেও তিনি বরিত হন।

হিন্দু মুসলমানে যাহাতে মিলন হয়, মিঃ জিন্না আবাল্য সেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে মিঃ জিন্না ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নূতন জাতীয় দল গঠন করেন। তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সমর্থন করিয়া পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের সভাপতিত্বে যে শাসন-সংস্কার তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির রিপোর্টে মিঃ জিন্না দ্বৈতশাসন একেবারে বাতিল করিবার জন্য

দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "The present system has failed and in our opinion it is incapable of yielding little results in future.

সরকারী আয়ব্যয় (Budget) সম্বন্ধীয় আলোচনাকালে, তিনি বরাবরই সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য তারস্বরে বলিয়াছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতে একটি সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

"লী" রিপোর্ট সমর্থনকল্পে তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমানদের দাবী যাহাতে রক্ষিত হয়, সেজন্য দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মিঃ জিন্না যেমন সুবক্তা, তেমনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় তিনি চিরদিনই আগ্রহান্বিত। তাঁহার সাধু ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

মহামতি খোদা বক্স

বাঁকিপুরের "খোদা বক্স লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করিয়া যে মহাপুরুষ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, যে লাইব্রেরী দর্শনে লর্ড কার্জ্জন একদিন বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে এইখানে", সেই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা খাঁ বাহাদুর মহম্মদ খোদা বক্সের প্রথম জীবন অতি সামান্য কেরাণা পদ হইতে আরম্ভ হয়।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট মঙ্গলবার বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছাপরা জেলায় মোহাম্মদ বক্স নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। মোহাম্মদ পাটনায় ওকালতী করিতেন এবং আরবী ও পারসী ভাষায় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইলেই তাহা কিনিয়া সংগ্রহ করিতেন! এইরূপ প্রবল জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার ছিল। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র খোদা বক্সকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি প্রায় দেড় হাজার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু ইহা পর্য্যাপ্ত নহে; তুমি আমার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করিও, একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এই পুঁথিগুলি সযত্নে রাখিও এবং আরও নূতন পুঁথি সংগ্রহ করিও।

পিতৃভক্ত খোদা বক্স পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। খোদা বক্স প্রায় অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বাঁকীপুরের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই লাইব্রেরীতে সমস্ত ভারতবর্ষের—এমন কি আরব, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশেরও প্রাচীন পুঁথি এবং চিত্র আছে। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ সহস্র পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পুঁথির মূল্য বহু লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া লাইব্রেরীটিতে বহু লক্ষ টাকার ইংরাজী পুস্তক ও

ছবি আছে। বস্তুতঃ খোদা বক্সের যাহা কিছু উপার্জ্জন, তৎসমস্তই এই লাইব্রেরীটিতে দান করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

খোদা বক্স যখন যেখানেই যাইতেন, কেবল পুঁথির অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহাকে কেহ পুঁথি সরবরাহ করিলে, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পারিতোষিক দিতেন। পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি অর্থের দিকে আদৌ দৃক্পাত করিতেন না। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর রাজপ্রাসাদের যে সমস্ত বহুমূল্য পুঁথি সিপাহী বিদ্রোহের সময় লুণ্ঠিত হওয়ায় নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, খোদা বক্স সেই সমস্ত পুঁথি বহু ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিয়া একজন আরবী ভাষাভিজ্ঞ লোককে নিযুক্ত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তিনি ব্লকম্যান সাহেবের লাইব্রেরী কলিকাতা হইতে বহু মূল্যে নীলামে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই লাইব্রেরীতে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি আছে, তাহা জগতে দুর্লভ। ইংলণ্ড হইলে সহস্র সহস্র জ্ঞানপিপাসু প্রতিদিন ঐ পাঠাগারে গিয়া জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতেন। এই লাইব্রেরীতে জবরু নামক পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বাইবেলের পারস্য ভাষায় অনুদিত পুস্তক রহিয়াছে, উহা সম্রাট আকবরের অনুরোধে অনুদিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের হস্তলিপি, তুরস্কের সুলতান লিখিত কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল বিজয়ের ইতিহাস, সম্রাট সাজাহানের বাল্য বয়সের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি গ্রন্থ, ঔরঙ্গজেরের মুন্সী এনায়েৎ উল্লা খাঁর "আলম- গিরি গ্রন্থ" দারাসিকোর স্বহস্ত লিখিত সাধু চরিত, তাইমুর বংশের ইতিহাস প্রভৃতি কত দুষ্প্রাপ্য অমূল্য সম্পদ রহিয়াছে।

খোদা বক্স বাল্যে জাতীয় ভাষা আরবী ও পারসী শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আসেন; কিন্তু হঠাৎ পিতার লোকান্তর হওয়ায় তিনি সংসার প্রতিপালনেব কঠোর পীড়নে পীড়িত হইয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হইলেন। একবার বাঁকিপুর মুন্সেফী আদালতে

একটি কেরাণীর পদ খালি হইলে খোদা বক্স প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ঐ চাকুরী পাইলেন না। তার পর অতি কষ্টে জজকোর্টে চাকুরীর যোগাড় করিয়া কিছুদিন জজের পেস্কারী ও স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারী করেন। কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই চাকুরী ছাড়িয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতী পরীক্ষা পাশ করিয়া বাঁকিপুরেই ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা শক্তি, যুক্তিতর্কের অবতারণা কৌশল প্রভৃতি গুণে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এত পশার বাড়িল এবং অর্থাগম হইতে লাগিল যে, তিনি আহারের সময় পর্য্যন্ত পাইতেন না। একবার কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার লুইস জ্যাক্‌সন তাঁহাকে সদরওয়ালার পদ দিতে চান, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। হাইদ্রাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর তাঁহার অসাধারণ আইন জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হায়দ্রাবাদের প্রধান বিচারপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিয়া পুনরায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট দিল্লীর দরবারে তাঁহাকে সম্মানজ্ঞাপক এক প্রশংসা পত্র দেন। তিনিই পাটনা মিউনিসপালিটী ও জেলা বোর্ডের প্রথম সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহামান্য ভারত সম্রাট তাঁহাকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "খাঁ বাহাদুর" ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধি দেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মনীষি মানবলীলা সংবরণ করেন।

তাঁহার পুত্র এস্ খোদা বক্সও জ্ঞানে, গুণে পিতার অনুরূপ ছিলেন। পিতা পুত্রের জীবনে প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শনে তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষার্থে ইংলণ্ড পাঠান। খোদা বক্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ ও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। প্রথমে তিনি ঢাকায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র

আরও প্রসারিত করিবার জন্য তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া অল্প দিনেই বিশেষ পসার করেন। তিনিও অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীর পাঠাগারের ন্যায় পাঠাগার অন্য কাহারও বাড়ীতে নাই। তাঁহার প্রণীত Contribution to the History of Islamic Civilisation ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষার ন্যায় আরবী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায়ও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার Withered Leaves নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার অক্সফোর্ড জীবনের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং "কলিকাতা রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। প্রাচ্যপ্রতীচ্য ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইস্‌লামের ইতিহাসে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি স্বদেশে ও বিদেশে পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি বিহারের অধিবাসী হইলেও স্বদেশকে তাঁহার নিজ জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতেন। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ইউরোপীয়ান পত্নী, একটি কন্যা ও একটি দৌহিত্রী রাখিয়া যান।

স্যার সালার জঙ্গ

হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্য আজ যে এত উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে, ইহার মূলীভূত কারণ স্যার সালার জঙ্গের দূরদর্শিতা ও অর্থনীতি জ্ঞান। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক বলিয়াছেন, স্যার সালার জঙ্গের ন্যায় কৃতবিদ্য শাসনকর্ত্তা দেশীয়দিগের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই।

স্যার সালার জঙ্গের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে সেখ ও ভাইস কারাণী সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশ মেদিনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিজাপুর রাজসরকারে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। স্যার সালার জঙ্গের পিতামহ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তৎপর তাঁহার খুল্লতাত হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হন। খুল্লতাতের মৃত্যুর পর স্যার সালার জঙ্গ মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে উক্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্যার সালার জঙ্গের পুরা নাম নবাব মীর তুরাব আলি খাঁ জঙ্গ সিরাজ-উদ-দৌল মোক্তার-উল-মূল্‌ক্ ডি, সি, এল, জি, সি, এস, আই। ১৮২৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং যখন তাঁহার বয়স ৪ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতামহ মুনীর-উল-মূলক (দ্বিতীয়) পরলোক গমন করেন। ফলে সালার জঙ্গ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিরাজ-উল-মুলকের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হইতে থাকেন। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে, এক সময়ে সালারের অতি কঠিন প্রকারের টাই-ফয়েড জ্বর হয়, চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার পিতামহ সম্রাট্ বাবরের ন্যায় সালার জঙ্গের জন্য খোদার

নিকট এই প্রার্থনা করিতে থাকেন যে, সালার জঙ্গ যেন সারিয়া উঠেন এবং ঐ পীড়া যেন তাঁহার নিজের হয়। সত্যই স্যার সালার বৃদ্ধের আকুল প্রার্থনায় সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিলেন আর বৃদ্ধ সেই টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

তের বৎসর পূর্ণ না হইলে স্যার সালার জঙ্গের নিয়মিতভাবে শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। তিনি শারীরিক স্বাস্থ্যে দুর্ব্বল ছিলেন এবং তাঁহার পারিবারিক অস্বচ্ছলতার জন্যও যথেষ্ট বাধা উপভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ মুনীর-উল-মুলক (২য়) ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া মারা যান এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর তাঁহার মন্ত্রীর ঋণ পরিশোধ করিয়া বন্ধক স্বরূপ সালার জঙ্গদের পারিবারিক সম্পত্তির অধিকাংশ রাখেন। এত ঋণ সত্ত্বেও সিরাজ-উল-মূলক স্যার সালার জঙ্গের যথোপ-যুক্ত শিক্ষা দানের কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। সাত বৎসর কাল সালার জঙ্গ একজন গৃহ-শিক্ষকের নিকট আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করেন। হায়দ্রাবাদে তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। উনিশ বৎসর বয়সে সালার জঙ্গ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইংরাজী ভাষায় এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, ইংরাজী ভাষায় তিনি তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় সহজে লিখিতে ও বলিতে দক্ষতা লাভ করিলেন। স্যার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"I conversed with both these great ministers Sir Salar Jung and Sir T. Madhava Row and found they are capable of talking on all subjects in as good English as my own."

বাল্যকালে স্যার সালার জঙ্গ অশ্বারোহণ করিতে বিশেষ ভাল-বাসিতেন এবং অনেকবার অশ্ব হইতে পড়িয়া আঘাতও পাইয়াছিলেন। তিনি হিসাবপত্রে সেই বাল্যাবস্থাতেই এত দক্ষ ছিলেন যে, তাঁহার

পিতামহীর জাইগীরের খাজনাপত্রের যাহা কিছু হিসাব পত্র তিনি রাখিতেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সালার জঙ্গ তেলিগানা জেলার তালুকদার বা কালেক্টার পদে নিযুক্ত হন। তারপর নিজাম তাঁহাদের পারিবারিক জাইগীর ছাড়িয়া দেওয়ায় তিনি পাঁচ বৎসরকাল নিজেদের জাইগীরের খাজনাপত্র আদায়ের ব্যবস্থা করেন এবং বিষয় কর্ম্মে জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এইখান হইতেই জমিদারী কার্য্য পরিচালনা ও শাসনে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পায়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল সিরাজ-উল-মূলক মারা যান। তখন মন্ত্রী নিযুক্তকরণ লইয়া নিজাম বাহাদুর মহাবিপদে পড়েন। নিজাম সালার জঙ্গকেই অতি ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসব; ষ্টেটের রেকর্ড কীপার লালা বাহাদুরের প্রস্তাবে নিজাম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে-একটী পূর্ণ দরবারে সালার জঙ্গকেই মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্যার সালার জঙ্গ নুতন পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত রাজ্যের অনেক সংস্কার করেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার উপর বিরূপ হন এবং লালা বাহাদুর তাঁহাকে মন্ত্রী পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। লোকে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার পদচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছিল, কিন্তু নিজাম তাঁহার অপেক্ষা বিশ্বাসী ও যোগ্য লোক কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দিল্লীর নিকট সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। হায়দ্রাবাদের মুসলমানগণ ব্রিটীশ শাসনের প্রতি বিরূপ হন এবং তাহারা ইংরেজ সরকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে এই আশঙ্কা করিয়া বহুসংখ্যক পুলিশ হায়দ্রাবাদে মোতায়েন হয়।

এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে আবার নিজাম নাসির-উদ-দৌল্লা মারা যান, কাজেই হায়দ্রাবাদ যে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে ইহা লইয়া নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। তখন সালার জঙ্গের কার্য্যকালমাত্র ৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি হায়দ্রাবাদ হইতে ব্রিটিশ বিদ্বেষ দূর করিয়া সকলকেই ইংরেজ সরকারের প্রতি সহানুভূতি ভাবাপন্ন করিয়া গড়িয়া তুলেন। অবিলম্বে একজন নুতন নিজাম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রেসিডেণ্ট রাজ্যাভিষেক উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়াই এই মর্ম্মে একখানি টেলিগ্রাফ বড়লাটের নিকট হইতে পান যে দিল্লীর পতন হইয়াছে। এই কথা সালার জঙ্গকে রেসিডেণ্ট জানান মাত্র সালার জঙ্গ উত্তর করেন যে, তিনি তিন দিন পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইয়াছেন এবং তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন। যদি সেই দরবারের সময় সালার জঙ্গ ঘূণাক্ষরেও জানাইতেন যে, দিল্লীর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী-দের হস্তে পরাজিত হইয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই মুসলমানেরা দরবারে উপস্থিত ইংরেজদিগকে একেবারে সেই মুহূর্ত্তে নির্ম্মূল করিয়া দিত। সালার জঙ্গ বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্রোহ প্রশমিত রাখিতে পারিলেন না, মৌলবীগণের প্ররোচনায় ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ প্লাকার্ড সমূহ হায়দ্রাবাদের রাস্তাঘাট সমূহে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। একজন মৌলবী সভা করিয়া জনতাকে উত্তেজিত পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। তখন মন্ত্রী সালারজঙ্গের আদেশে সেই মৌলবীকে গ্রেপ্তার করা হইল। একজন ফকীরকেও উক্ত অপরাধে বন্দী করিয়া রাখা হইল। আদেশ দেওয়া হইল, যে কেহ ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করিবে তাহাকে গুলি করা হইবে। মন্ত্রী সালার জঙ্গের এই কঠোর আদেশে দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল, তাহার ফলে মাদ্রাজেও আগুন জ্বলিল না।

হায়দ্রাবাদকে সেই সময় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এত আশঙ্কা করিতেছিলেন

যে, বোম্বাইয়ের গভর্ণর হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্টকে তারযোগে জানাইয়াছিলেন—If the Nizam goes, all is lost" অর্থাৎ মহামান্য নিজাম বাহাদুর যদি আমাদের বিরুদ্ধে যান, তবে সবই শেষ হইবে।" কিন্তু যখন ইংরেজগণ জানিতে পারিলেন যে, নিজাম ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন না, তখন তাঁহারা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কর্ণেল ব্রীগস্ বলেন, যদি সেই সময় নিজাম বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান ত দূরের কথা বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ বিদ্বেষানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু সালার জঙ্গের দূরদর্শিতার জন্য তখন নিজাম ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা করেন।

হায়দ্রাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের গৃহ সেকান্দ্রাবাদের ছাউনী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ৫শত রোহিলা ও ৪ হাজার বিদ্রোহী ঐ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। সালারজঙ্গ এই আক্রমণের আভাষ পূর্ব্ব হইতে পাইয়া কর্ণেল ডেভিডসনকে সাবধান করিয়া দেন, কর্ণেল সেকান্দ্রাবাদ হইতে সৈন্য চাহিয়া পাঠান, সেই সৈন্যেরা আসিলে স্যার সালার জঙ্গ যে কতকগুলি আরব সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই আরব সৈন্য দলের সহিত তাহাদের মিলন হয় এবং এই সম্মিলিত সৈন্য বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ করে। বিদ্রোহীদের একজন নেতাকে গুলি করিয়া মারা হয় এবং অন্যান্য কতিপয় বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া কাহাকেও বা কারারুদ্ধ আবার কাহাকেও বা নির্ব্বাসিত করা হয়। প্রধান প্রধান বিদ্রোহীকে ফাঁসী দেওয়া হয়, আর যাহারা হায়দ্রাবাদে নিজামরাজ্য মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লয়, স্যার সালার জঙ্গ তাহাদিগকে ধরিয়া রেসিডেণ্টের হস্তে যথাযোগ্য শাস্তির জন্য প্রদান করেন। মৌলবীরা আসিয়া নিজামকে বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু স্যার সালার জঙ্গের পরামর্শে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন।

রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেভিডসনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, সেই শঙ্কটকালে রেসিডেন্সী ছাড়িয়া গেলেও মহা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করা হইত।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য নিজাম-আফজুল-উদদ্দৌলা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র মহাবুব আলি খাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্যার সালার জঙ্গ ও সাম্‌স্‌-উল-উমারাকে নিজামের নাবালক অবস্থায় তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বেরার রাজ্যকে নিজাম রাজ্যভুক্ত করার চেষ্টার জন্য একাধিক বড়লাটের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়। লর্ড নর্থব্রুককে তিনি স্পষ্টতঃ লিখেন—"Either I must recover Berar or I must be convided of the justice of the reasons for withholding it or I must die." ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেরার রাজ্য নামতঃ নিজামের রাজ্যভুক্ত ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে উহা পুণার পেশোয়া রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ বেরার রাজ্য নিজামকে ছাড়িয়া দিবার জন্য একখানি চিঠি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে লিখেন। কিন্তু বড়লাট তদুত্তরে লিখেন, যতদিন নিজাম সরকার সৈন্যদিগের ব্যয়ভার নিয়মিত-ভাবে বহন না করিবেন, ততদিনে বেরারকে নিজাম রাজ্যভুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব থাকিবে। কিন্তু সার সালার জঙ্গ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড সলিস্‌বারির নিকট দরখাস্ত করেন। ভারত-সচিব লিখেন যে, যতদিন বর্ত্তমান নিজাম নাবালক থাকিবেন, ততদিন কোন মতে বেরারের সমস্যা সমাধান হইবে না। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা নিজাম সরকারকে দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজামের সহিত নূতন সন্ধি করেন এবং বেরার রাজ্য তদবধি চিরদিনের নিমিত্ত ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্যার সালার জঙ্গ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন,

তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। স্যার সালার জঙ্গ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া দেখেন, খাজনা আদায়ের পদ্ধতি শোচনীয়। সৈন্যদের ব্যয় ভার বহন করিয়া মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা নিজাম সরকারের থাকে তালুকদারদের সহিত চুক্তি করিয়া খাজনা আদায় করা হয়, ঐ তালুক-দারেরা প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া রাজস্ব আদায় করে। ইহা ছাড়া কোন কোন জেলায় আরবদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত, এই আরবেরা নিজাম সরকারে অগ্রিম টাকা ধার দেয় এবং সেই ধার তাহারা রাজস্ব আদায় করিয়া পরিশোধ করিয়া লয়। স্যার সালার জঙ্গ একটি ফোর্ট স্থাপন করিয়া দুর্দ্দান্ত আরবদিগকে জেল ও নির্ব্বাসন দেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সালার জঙ্গ বাঁধা দেওয়া জমি সমস্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম হন, উহার বার্ষিক আয় ৪০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের চাকুরী হইতে প্রায় ৪ হাজার পাঠান ও আরবকে অপসারিত করেন। পুরাতন তালুকদার-দিগকে বরখাস্ত করিয়া বিশ্বাসী লোকদিগকে তৎস্থানে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে একটি সেণ্ট্রাল ট্রেজারি স্থাপন করিয়া তথায় সমস্ত রাজস্ব সংগৃহীত হইতে থাকে। রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজ্যকে চারি ভাগে ভাগ করা হয় এবং সালার জঙ্গ নিজের অধীনে ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা রাখেন।

বহু বর্ষ ধরিয়া হায়দ্রাবাদে মুসলমান ও হিন্দু বালকবালিকা বিক্রয়ের ব্যবসায় চলিতেছিল, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্যার সালার জঙ্গ ঘোষণা দ্বারা উক্ত প্রকার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন। প্রত্যেক দিন রাজ্য মধ্যে কোথাও না কোথাও ডাকাতি হইত, সালার জঙ্গ সৈন্যদল গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দস্যুদলকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এজন্য একটি বিশেষ "রোহিলা কোর্ট" পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, স্যার সালার জঙ্গ বুভুক্ষিতদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে আসন্ন মৃত্যুর

কবল হইতে রক্ষা করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন কার্য্যের জন্য একটি বিস্তৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন; আজিও তাঁহার পদে অভিষিক্ত মন্ত্রীগণ সেই নিয়মানুসারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রধান মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন বিভাগীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্যার সালার জঙ্গের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্যার সালার জঙ্গের পূর্ব্বে রাজ্যের কোন নিয়মিত আদালত ছিল না। তিনি হায়দ্রাবাদে একটি কোর্ট স্থাপন করেন, উহাতে একজন চীফ জজ ও ৪ জন সহকারী জজ নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। দুর্দ্ধর্ষ রোহিলাদের দমন করিবার জন্য জেলায় জেলায় সৈন্য সামন্তসমেত "জিলাদার" নিযুক্ত করা হয়। ঠগী ও ডাকাতি মামলার বিচারার্থ একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার বিচারার্থ একজন হিন্দু বিচারপতি লইয়া একটি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয়ার্থ একটি ষ্ট্যাম্পের আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সালার জঙ্গ পুলিশ বিভাগের সংস্কার করেন। পুলিশের বড় কর্ত্তা হন, ইন্স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। তাঁহার অধীনে মহতা মিম্‌ম (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টস্) আমিন (ইন্স্পেক্টর) জমাদার ও দফাদার থাকে। হায়দ্রাবাদ সহরের জন্য একজন কোতোয়াল (পুলিশ কমিশনার) নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি সার্ভে বিভাগ খোলা হয়। তখন হায়দ্রাবাদে পুরাতন পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কোরাণ পড়ান হইত দেখিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সালার জঙ্গ "ওরিয়েণ্টাল" কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কলেজে ইংরেজীও শিখান হইত। কয়েক বৎসর পরে প্রতি প্রধান গ্রামে এবং প্রতি জেলার সদরে একটি করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিক্ষা বিভাগটি একজন সেক্রেটারী ও একজন ডিরেক্টরের অধীনে রাখা হয়। একটি সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং ও

মেডিকেল স্কুল খোলা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ছাদের গেটের স্কুলটি কলেজে পরিণত করা হয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত উহা সংশ্লিষ্ট (Affilia-tion) হয়। অতঃপর "নিজাম কলেজ" ও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ৫ জন বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

স্যার রিচার্ড টেম্পল বলেন, স্যার সালার জঙ্গ সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা অমূল্য। বড়লাটও সালার জঙ্গকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া চিঠি লিখেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামকে একলক্ষ টাকা মূল্যের বৃটিশজাত দ্রব্য ও তাঁহার মন্ত্রী সালার জঙ্গকে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ব্রিটিশজাত দ্রব্য দেওয়া হয়। রাইচর ও ধারাসিও জেলা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সোরাপুর রাজ্যও নিজাম রাজ্যের তালিকাভুক্ত করা হয়।

কিন্তু যেভাবে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সালার জঙ্গ বিদ্রোহীদের দমন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্রোহীদল তাঁহার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ যখন তিনি দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় একজন উন্মুক্ত তরবারি লইয়া সালার জঙ্গকে আক্রমণ করে, কিন্তু নিজামের দেহরক্ষী তৎক্ষণাৎ তাহাকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করে। তিনি হায়দ্রাবাদে শাসন সংস্কার চালাইতে চেষ্টা করিয়াও বিশেষ অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু নিজাম তাহা বুঝিতে পারিয়া সালার জঙ্গের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী বিশ্বাসবান হন। নিজাম সালার জঙ্গকে এরূপ ভাল-বাসিতেন যে, একদিন দরবারে তিনি তাঁহাকে কতকগুলি রত্ন উপহার দিয়াছিলেন এবং সালার জঙ্গ অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া আরোগ্য লাভ করিলে নিজাম দরিদ্রদিগকে বহু টাকা বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন।

একবার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত নিজামের কতকগুলি অপরাধীরে সাজা লইয়া মনোমালিন্য হয়, নিজাম স্যার সালার জঙ্গকেই ইহার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করায় স্যার সালার জঙ্গ পদত্যাগ করেন। অতঃপর রেসিডেণ্ট স্যার জর্জ্জ ইয়ুলের পরামর্শে ক্ষমা প্রার্থনা করায় নিজাম পুনরায় তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার স্যার সালার জঙ্গ যখন ঈদ্ দরবারে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার গুলি ছোঁড়া হয়, কিন্তু একটী গুলি তাঁহার উষ্ণীষে ও অন্যটি তাঁহার অনুচরের গায়ে লাগে। নিজাম স্যার সালার জঙ্গের জীবন রক্ষায় আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ প্রিন্স অব ওলেল্স্ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ডিউক অব সাদারল্যাণ্ডও আইসেন, ডিউক হায়দ্রাবাদে গিয়া স্যার সালার জঙ্গের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুরোধে স্যার সালার জঙ্গ ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতে সম্মত হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্যার স্যালার জঙ্গ ইউরোপ গমন করেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ জাতির যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ইংরেজগণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল লর্ড লিটন ভারতের বড়লাট হইয়া বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্যার স্যালার জঙ্গ বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন স্যার স্যালার জঙ্গ ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ৫ই মে রোমে গিয়া রাজা ইমানুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহামান্য পোপ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। রোম, নেপল্স ও ইটালির অন্যান্য প্রধান প্রধান নগর পরি-দর্শন করিয়া স্যার সালার জঙ্গ ১৩ই মে তারিখে প্যারিসে উপস্থিত হন। তথায় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে নিজ

প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তৎপর তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ফোকষ্টোনে উপস্থিত হইলে ডিউক অব সাদারল্যাণ্ড তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ফোকষ্টোনের মেয়র একটি অভিভাষণ দ্বারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। ইংলণ্ডে গিয়াও তাঁহাকে প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তাঁহার পায়ের আঘাত এমনই গুরুতর হইয়াছিল যে, লণ্ডনে অবস্থানকালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্য সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ২০শে জুন যুবরাজ স্যার সালার জঙ্গের সম্মানার্থ একটি ভোজ দেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সমূহে এইরূপ ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়—Our new guest is the man who when Delhi had fallen, and our power was for a moment in the balance, saved Southern India for England."

২১শে জুন তিনি অক্সফোর্ডে যান, তথায় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডি সি এল্" এই অনারারি ডিগ্রী প্রদান করেন। ৩রা জুলাই মার্কুইস অব সলিস্‌বারি তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত করেন। তিনি মহারাণী ও রাজপরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত নৈশভোজন করেন। ৫ই জুলাই স্যার স্যালার জঙ্গ ও তাঁহার সঙ্গীগণ বাকিংহাম প্রাসাদে রাজকীয় নাচগান দেখেন এবং পরদিন তদানীন্তন ভারত সচিব মার্কুইস অব সলিসবারি তাঁহাকে ভোজনে আপ্যায়িত করেন। স্যার সালার জঙ্গ লণ্ডন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন তাঁহাকে এক-খানি অভিনন্দন দেন, অতঃপর ট্রেনথম হলে ডিউক অব সাদারল্যাণ্ডের সহিত এক সপ্তাহকাল বিশেষ আনন্দের সহিত অতিবাহিত করিয়া স্যার সালার জঙ্গ স্কটল্যাণ্ডে যান। তথায় ইন্‌ভারনেস, ডিং, ওয়াল, টেন ও উইকের টাউন কৌন্সিল হইতে অভিনন্দন লাভ করেন। ২২শে তারিখে তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে গিল্ড হলে একটি বিরাট সভায় স্যার

স্যালার জঙ্গকে Freedom of the city of London দেওয়া হয়। লর্ড মেয়র তাঁহার স্বাস্থ্য কামনা করেন। ২৬শে জুলাই স্যার সালার জঙ্গ ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশন ও ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্স হইতে প্রতিনিধি-গণকে অভ্যর্থনা করেন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেষ্টারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র লিখিয়াছিল—"He was entertained by the highest in the land. His manner is so like that of a wellbread English Gentleman."

দুই মাস লণ্ডনে থাকিয়া সার স্যালার জঙ্গ ভারতে ফিরিবার পথে প্যারিসে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে ব্রিণ্ডিসি আসিয়া জাহাজযোগে ৪ মাস পরে ভারতে উপস্থিত হন। আসিবার সময় একখানি সৈনিক পূর্ণ জাহাজের সহিত তাঁহাদের জাহাজের সাক্ষাৎ হয়। সৈনিকেরা স্যার স্যালার জঙ্গ আসিতেছেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া "Three cheeys for churs Jung, the saviour of India" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এরূপ চীৎকার করিতে থাকে যে, বহুক্ষণ যাবৎ তাহাদের সেই ধ্বনি অনন্ত সমুদ্র বক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ২৬শে আগষ্ট তারিখে তিনি হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হন।

তাঁহার আমলে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টেরও সংস্কার সাধন করা হয়। বহু পুস্করিণীর সংস্কার. রাস্তা, ঘাট মেরামত ও নির্ম্মাণ করা হয় এবং কয়েকটী সরকারী অট্টালিকাও নির্ম্মিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ ওয়াদী রেলওয়ে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। এই রেলপথের দ্বারা নিজাম রাজ্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সহিত একত্রীভূত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদরাজ্যে নিয়মিত ডাক বিভাগ এবং হায়দ্রাবাদে একটী সরকারী টাকশালও খোলা হয়। হায়দ্রবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, রাইচর ও

ও গুলবর্গায় মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। স্যার সালার জঙ্গ যখন প্রধান মন্ত্রী হন, তখন সৈন্য বিভাগে রাজ্যের ব্যয় ছিল ৮০লক্ষ টাকা, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সাময়িক ব্যয় দাঁড়ায় মাত্র ২০ লক্ষ টাকা। এই ভাবে তিনি যে হায়দ্রাবাদের কত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই এককথায় তাঁহাকে "নব্য হায়দ্রাবাদের" সৃষ্ট কর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে G. C. S. I উপাধি দেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি দিল্লীর রাজকীয় সম্মেলনে ১৭টি তোপধ্বনি পান। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সালার জঙ্গ হায়দ্রাবাদের একমাত্র রিজেণ্ট হন; ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম রিজেণ্ট নবাব সামশুল উমারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী স্যার সালার জঙ্গ কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত ও ইউ-রোপের নানা স্থান হইতে শোকসূচক তার আসিতে থাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ হইতে লর্ড রিপণ শোকসূচক তার প্রেরণ করেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। তাহাতে চারিদিকে কাল রেখা দিয়া ইহা প্রকাশিত হয়—"With a a feeling of deep •regret the Governor-General in Council announces the death on the evening of the 8th instant from Cholera of His Excellency Nawab Sir Salar Jung G. C. S. I. Regent and Minister of the Hyderabad state. By this unhappy event the British Government has lost an experienced and enlightened friend, H. H. the Nizam a wise faithful Servant and the Indian Community one of its most distinguished represntatives."

তিনি অতি সাদাসিদে পোষাক পরিতেন এবং সকলেই নিঃসঙ্কোচে

তাঁহার নিকট যাইতে পারিত। তিনি দুই কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া যান। পুত্রদ্বয়ের নাম মীর লায়েক আলী খাঁ ও মীর সদাত আলি খাঁ। মীর লায়েক আলি ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, মীর সদাতও ষ্টেট্ কাউন্সিলের সদস্য ও অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে সদাত আলি খাঁর পুত্র নবাব মীর ইউসুফ আলি খাঁ প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯১৪ সালে তিনি পদ ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য লাভার্থে ইউরোপ যান।

সৈয়দ মামুদ

স্যার সৈয়দ আহম্মদের পুত্র সৈয়দ মামুদ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বেনারস হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গিয়া ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে পাঠ করেন। তখন তাঁহার পিতা স্যার আহম্মদও তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ক্যাম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে মিষ্টার আনন্দমোহন বসু তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। যে ১৭ মাসকাল তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই ১৭ মাস কাল তিনি তাঁহার পিতাকে মহম্মদের প্রকৃত জীবনী লিখিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে স্যার সৈয়দ আহম্মদ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার নিয়মাবলীর খসড়া (Scheme) প্রস্তুত করণে সৈয়দ মামুদ পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহারাই প্রযত্নে ও চেষ্টায় তাঁহার পিতা আলিগড় কলেজ গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কলেজকে সৈয়দ মামুদ এত ভালবাসিতেন যে, তিনি হাইকোর্টের জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই কলেজে যোগদান করেন এবং কলেজের ক্লাসে ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি প্রথমে কলেজের ট্রাষ্টি ছিলেন, পরে উহার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি History of English education in India. নামক পুস্তক লেখেন, উহা চিন্তশীলতায় পরিপূর্ণ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ মামুদ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন এলাহাবদে ব্যারিষ্টারী করিবার পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রায়বেরিলীতে জেলা জজ হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে তিনি অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজ হন, তারপর পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলে

তাঁহাকে স্থায়ীভাবে বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিরপেক্ষ বিচারক-রূপেই তিনি জনসমাজে সুপরিচিত, কোন কোন মামলার তিনি যে রায় দিয়াছিলেন তাহা আজিও প্রামাণিক হইয়া রহিয়াছে। স্যার হুইট্‌লী ষ্টোক্‌স্‌ তাঁহার Anglo Indian code এ উল্লেখ করিয়াছেন "No Judgements in the whole series of the Indian law reports are more weighty or elluminating than those of the Hindu Muthuswami Iyer or the Mahamedan Syed Mahamood.
তিনি বাধ্য হইয়া জজীয়তী পদে ইস্তফা প্রদান করেন। জজীয়তী ছাড়িয়া তিনি আলিগড়ে গিয়া অধ্যাপকতা করিতে থাকেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গিয়া পুনরায় তথায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

তিনি কি রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন, সে সম্বন্ধে Hindusthan review পত্রে স্বর্গীয় ডাঃ সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর পর লিখিয়া-ছিলেন, তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিচারপতি হিসাবে যে সমস্ত দেশীয় বিচারপতি হাইকোর্টে বসিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন। তিনি ফার্সী ও ইংরাজী কবিতা বিশেষ ভালবাসিতেন, এবং অনেকদিন সন্ধ্যার সময় নিজে নিজে উহার আবৃত্তি করিতেন! তিনি গ্রে ও টেনিসনের কবিতার অনুকরণে অনেক কবিতা নিজে রচনা করিয়া-ছিলেন। "সুফী" ধর্ম্মমতের তিনি পরিপোষক ছিলেন এবং বেদান্ত দর্শনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। দেশে সংস্কৃত অধ্যাপনার পদ তুলিয়া দিলে তিনিই পুনরায় ঐ পদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দাতা ছিলেন এবং মনে করিতেন অর্থোপার্জ্জন অপরকে দান করিবার জন্যই। তাঁহার পিতা মহম্মদের যে জীবনী লেখেন, তিনি তাহা ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় Law of evidence in British India নামক পুস্তকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। History of

Islam নামক পুস্তক লিখিতে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে পারেন নাই। ১৯০৩ সালের ৮ই মে সৈয়দ মামুদ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী—শুধু স্বধর্ম্মাবলম্বী কেন সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন নিরপেক্ষ বিচার,ক সমাজ সংস্কারক ও গভীর পণ্ডিতকে হারাইয়াছে।

সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী

ডাঃ সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী হায়দ্রাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র শুধু হায়দ্রাবাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারত-সচিবের সভার সদস্য হন। তখন লর্ড মর্লে ভারত সচিব।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী (পরে নবাব আলি ইয়ার খাঁ বাহাদুর মোতামান জঙ্গ, ইমাদ-উদ-দৌলা, ইমাদ-উল্-মুল্‌ক সি-এস-আই) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গয়া জেলার সাহেবগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলগ্রামের বিখ্যাত সৈয়দ বংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। সৈয়দ বিলগ্রামীও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাড়ীতে তিনি একজন মৌলবীর নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি বাল্যে অশ্বারোহণ করিতেন বলিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠকায় ছিলেন।

কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক হন এবং তালুকদারদের মুখপত্র Lucknow Times পত্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজামের মন্ত্রী স্যার সালার জঙ্গের আহ্বানে হায়দ্রাবাদে যান এবং হায়দ্রাবাদেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার সালার জঙ্গের প্রস্তাবানুসারে তাঁহার নাম "বিলগ্রামী" রাখা হয়।

প্রথমে তিনি প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া পরে হায়দ্রাবাদের শিক্ষা-সচিব ও তৎপরে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হন। কিছু দিন তিনি মহামান্য নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে তৃতীয় সালার জঙ্গের পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। এইভাবে নিজাম রাজ্যে উচ্চ পদে প্রায় ৫০ বৎসর কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য মহামান্য নিজাম তাঁহাকে নবাব আলি ইয়ার খাঁ বাহাদুর মোতামান জঙ্গ ইমাদ-উদ-দৌলা ও ইমাদ-উল-মুলক্ এবং গভর্ণমেণ্ট সি এস্-আই উপাধি প্রদান করেন।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও নূতন বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া যত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৎসমস্তই সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামীর চেষ্টার ফল।

তিনি দুইবার মুসলমান শিক্ষা কন্ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটী কমিশনে সদস্য নিযুক্ত করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মর্লে তাঁহাকে ভারত-সচিবের সভার সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পদ-ত্যাগ করেন। ইংলণ্ড হইতে হায়দ্রাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাকে পুনরায় হায়দ্রাবাদের মন্ত্রী তৃতীয় সালার জঙ্গের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়।

সৈয়দ হোসেনের জীবন অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র স্বরূপ ছিল।

বিচারপতি শাহ দীন

মাননীয় মিঞা মহম্মদ শাহদীনের পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ ইসাক লাহোরের সালামার উত্থান যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানটি সম্রাট্ সাজাহানকে প্রদান করেন। সম্রাট সেখানে একটি রমণীয় উত্থান রচনা করেন। সম্রাট্ ইহার পরিবর্ত্তে মহম্মদ ইসাককে বাঘবনপুরা স্থান প্রদান করেন। তাঁহার চতুর্থ বংশধর মহম্মদ ইয়ুসুফ সম্রাটের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ ফজিলকে দাক্ষিণাত্যে বিশেষ কোন গুরুতর রাজ-কার্য্যে পাঠান হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "নবাব" উপাধি প্রদান করেন। মহম্মদ ফজিলের পঞ্চম বংশধর মিঞা কোয়াদীর বক্স বিচারপতি শাহদীনের পিতামহ ছিলেন। মিঞা কোয়াদীর আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক ও কবি ছিলেন।

এইরূপ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া মিঃ শাহ দীন শৈশব হইতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে একটী গ্রাম্য স্কুলে Middle Vernacular পড়িয়া পরীক্ষায় লাহোর জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হন।

সেই সময়ে উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ম্যাট্রি-কুলেশান পরীক্ষায় তিনি লাহোর প্রদেশে ইংরাজী শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে অনুবাদকের কার্য্য দিতে চাহেন, কিন্তু তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, গুণানুসারে তিনি উচ্চ স্থান লাভ করেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং নানা বৃত্তিলাভ করিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন।

লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ে বিশেষ পসার করেন; কিছুকাল তিনি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের লিগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্সার হন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই পদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। ১৯০৪ সালে তিনি পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে লাহোর চীফ কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হওয়ায় তিনি উক্ত সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। কিন্তু ১৯০৮ সালে পুনরায় চীফ কোর্টের বিচারপতি হওয়ায় উক্ত সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "আঞ্জু-মান-ই-ইসলাম" প্রতিষ্ঠা করেন; গ্রেট ব্রিটেনে তৎপূর্ব্বে আর কোন মুসলমান সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লণ্ডন ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি উক্ত সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। লাহোরে আসিয়াই তিনি "মুসলমান যুবক সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি উহার সভাপতি হন। লাহোরের নব্য মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে তাঁহাদের Guide, Philosopher ও Friend মনে করিত।

স্যার সৈয়দ মামুদের মৃত্যুর পর আলিগড় কলেজের দুরবস্থা উপস্থিত হয়, তিনি বহু চেষ্টা ও যত্নে কলেজকে রক্ষা করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তিনি "মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের" সভাপতি হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টি হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার উক্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। দশ বৎসর যাবত তিনি উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন।

বিচারপতি শাহ দীনের সাহিত্য, শিক্ষা ও আইন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা এ দেশের অনেক মাসিক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তত্রত্য National Indian asociation এর সংবাদ পত্রে লিখিতেন। উর্দ্দূ ভাষায় কবিতা লিখিতেও তিনি সুপটু ছিলেন। ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাব চীফ কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। একবার তিনি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। জজ হইবার পূর্ব্বে ১৯০৬ সালে সিমলায় মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারে মুসলমানদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য যে প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মিঃ শাহ দীন তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৮ সালের ২রা জুলাই ৫০ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্যার আব্বাস আলি বেগ

মির্জা আব্বাস আলিবেগ সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামীর পরে ভারত সচিবের পরামর্শ সভার সদস্য হন।

তিনি বাবরের বংশধর। মিঃ বেগের পিতা ব্রিটিশ সৈন্য দলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। আফগান, শিখ ও শিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের অনুকূলে যুদ্ধ করিয়া বহু পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

মিঃ বেগ বোম্বাইয়ের উইলসনকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি বরাবর বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজের সমস্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া "বি-এ" পাশ করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বেগ বোম্বাই প্রেসিডেন্সী দক্ষিণ বিভাগের ১১টি জেলার মুসলমান স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হন। তাঁহার কার্য্যকালে মুসলমান শিক্ষা এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তিন বৎসরের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল। মুসলমান বালিকাদিগের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং শিক্ষকদিগকে শিক্ষা-দিবারও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাঞ্জিরা ষ্টেটের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন। তিনি যখন দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন, তখন রাজকোষ একেবারে শূন্য ছিল এবং রাজদপ্তরের সর্ব্বত্র অ-বন্দোবস্ত ও ঘুস লইবার প্রাধান্য ছিল। তিনি প্রত্যেক বিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন এবং রাজকোষে অর্থাগম হয়। প্রধান প্রধান সহরে মিউনিসিপালিটী ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারই চেষ্টায় "ভিক্টোরিয়া জলের কল" স্থাপিত হয়, স্কুলের

সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বেগ দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করেন এবং দেশীয় সিভিলিয়ান পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায় থানা জেলার সহকারী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাথিওয়াড়ের প্রভাসপট্টন কমিশনে বিশেষ রাজনীতিক সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ে অল্পদিনের জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কাজ করেন। ঐ বৎসরে তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্য অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্যের সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও দেশীয় রাজ্যের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর রেজিষ্টারের পদও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর তিনি সিভিল ও মিলিটারী পরীক্ষা বোর্ডের ও বিভাগীয় পরীক্ষা কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জষ্টিস অব দি পীস হন।

ইহা ছাড়া তাঁহাকে দরবার প্রভৃতির ব্যাপারে রাজনৈতিক বিভাগকে সহায়তা করিতে হইত। যুবরাজ যে সময়ে ভারত পরিদর্শনে আসেন, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনাগড় ষ্টেটের দেওয়ান হইয়া যান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তথায় কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার আমলে রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনের চারি বৎসরের মধ্যে তিনি রাজ্যের নানাদিকের উন্নতি সাধন করেন, বিশেষভাবে সেচ বিভাগের কার্য্য এত উন্নত হয় যে, কৃষিক্ষেত্র সমূহে প্রয়োজনানুরূপ জল সরবরাহ হওয়ায় চাষীরা প্রভূত পরিমাণে ফসল পায়। তাঁহার চেষ্টায় রাস্তার ধারে প্রায় ৫০ হাজার বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বোম্বায়ের গভর্ণর স্যার জর্জ্জ ক্লার্ক জুনাগড় পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন—"A fair future lies

before junagadh under the beneficent rule of your Highness. All that His Highness owes to the wise and beneficent administration of Mr. Baig.

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারতসচিব জন মর্লে অকস্মাৎ তাঁহাকে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে নিয়োগ করিলে সকলেই তাঁহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছিলেন—So able, experienced and independent a representative." ৭ বৎসরকাল তিনি ভারত-সচিবের সভার সদস্য ছিলেন, শেষ বৎসরে তিনি কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যোগ্যতায় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ইণ্ডিয়া কাউন্সিল হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সম্রাট তাঁহাকে কে, সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

স্যার আব্বাস পারশ্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আটটি দেশীয় ভাষা জানিতেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে এল্-এল্-ডি উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার পত্নীও সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। একজন লেখক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"Lady Ali Baig's presence in London, gave British women the opportunity to come in contact with one of the most cultured of Indian woman. She is a progressivist in thought, speech and action, vitally interested in movements of reform, and withal a devoted wife and mother and a careful housewife."

স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা

মাননীয় খাঁ বাহাদুর স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা কে, সি, আই, ই কেটি মিঃ আউসুখ হোসেন খাঁ সাহেবের পুত্র। তিনি প্রাচীন কার্ণাটক বংশের বংশধর ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং সৈদাপেট জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভেলোরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় তিনি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মফঃস্বলে অনেক বে-সরকারী পদে অনারারি কর্ম্মচারীরূপে কাজ করেন।

১৩ বৎসরকাল তিনি ভেলোরে ওকালতী করেন এবং উকিল সভার নেতা হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া জনহিতকর কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভেলোর মিউনিসিপ্যালিটীর বে-সরকারী অনারারী চেয়ারম্যান হন। তিন বৎসর কাল তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতী ত্যাগ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী হন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরকাল আবার তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানগিরি করেন এবং অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহারই আমলে সহরে জলের কল ও ড্রেণ প্রথা প্রচলিত হয়। ফলে সহর হইতে কলেরা দূর হয়। এক কথায় তাঁহারই চেষ্টায় ভেলোর একটি আদর্শ সহরে পরিণত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট "খাঁ বাহাদুর"

উপাধি প্রদান করেন। ভেলোর তালুক বোর্ডের সভাপতি ও পরে উত্তর আর্কট জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতিরূপে তিনি বোর্ড চালনার বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই জন্য ১৯১৭ সালে তাঁহাকে উত্তর আর্কটের জেলাবোর্ডের প্রথম বে-সরকারী সভাপতি করা হয়। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি একজন বাগ্মীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি সকলসম্প্রদায়ের নিকট এতদূর শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য হইবার জন্য হিন্দু ভোটদাতারই অধিক সংখ্যায় ভোট দিয়াছিল। হিন্দুরা অন্য হিন্দু পদপ্রার্থীকে ভোট না দিয়া তাঁহাকে ভোট দিয়াছিল।

১৯১১ সালে তিনি আমন্ত্রিত হইয়া দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

মাদ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর, লর্ড উইলিংডন তাঁহাকে ৬ মাসের জন্য শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োজিত করেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহাকে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল বিলের আলোচনার জন্য সভ্য নিযুক্ত করা হয়।

১৯২০ সালে তিনি মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কমিশনার নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই তিনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থায়ীভাবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তাঁহার উপর ভূমি রাজস্বের ভার ছিল। রয়াল কমিশনে তিনি স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় শাসন সংস্কার কমিটিতে তিনি প্রাদেশিক প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ১৯২২ সালে তাঁহাকে "নাইট" উপাধি দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হন ; তদবধি তিনি দিল্লী বিশ্বাবিত্থালয়েরও

প্রো-চ্যান্সেলর হন। ঐ সালে তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিও দেওয়া হয়।

মাদ্রাজের জনসাধারণ তাঁহাকে এতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে, তিনি যখন মাদ্রাজ হইতে দিল্লীতে আসেন, তখন ইউরোপীয়ান, হিন্দু ও মুসলমান সকল শ্রেণী মিলিয়া তাঁহাকে বহু বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিল।

স্যার মহম্মদ একজন বাগ্মী ও সুলেখক। ব্যবহারে তিনি অতি শিষ্ট এবং মনোভাবে অত্যন্ত উদার। এই সমস্ত কারণে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। রাজনীতিজ্ঞ ও যোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া তিনি দেশময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজও তাঁহাকে তাঁহাদের নেতৃপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ১৯২৩ সালের ২৩ শে জানুয়ারী তারিখের Times of India পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশিত হয়।

An accomplished speaker, courageous in his convictions and sympathetic in his outlook, he has made his mark as an administrator and statesman and not yet has he reached the pinnacle of his political career."

From a seat in a Municipal Council to one in the cabinet of the Indian Empire, the record of this distinguished public servant is a shinning example to every public worker and patriot.

অর্থাৎ স্যার হবিবুল্লা সুবক্তা। যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না, তিনি জনহিতকর কার্য্যে সহানুভূতিসম্পন্ন। মিউনিসিপ্যাল কাউনিসল হইতে তিনি ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী সভায় আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় কর্ম্মী ও প্রতিভাবান, ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

আলি ভ্রাতৃদ্বয়

মৌলানা মহম্মদ আলি

মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইঁহারা সাধারণতঃ "আলি ভ্রাতৃদ্বয়" নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মোরাদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলির পিতামহ আলি বকস্ খাঁ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। রামপুর ষ্টেটে তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশ জাতির বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজভক্তির জন্য তিনি মোরাদাবাদ জেলায় একটি নিষ্কর জাইগীর উপহার পান। মৌলানা মহম্মদ আলির পিতা আবদুল আলি খাঁও রামপুর ষ্টেটে উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ২৭ বৎসরের এক বিধবা পত্নী রাখিয়া কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যু সময়ে শৌকত আলি দুই বৎসরের বালক ও মহম্মদ আলি একটি শিশু মাত্র। মাতার যত্নে ও শুশ্রূষায় দুই ভাই লালিত পালিত হন।

ইঁহাদের বিধবা জননী আপন হস্তে পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। আলিগড় কলেজে উভয় ভ্রাতা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের জননীর নাম বাই আম্মা। বাই আম্মা পুত্রদ্বয়ের সহিত সদা সর্ব্বদা থাকিতেন, এমন কি আলি ভ্রাতৃদ্বয় যখন চিন্দ্‌ওয়ারায় অন্তরীণ তখনও তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম্মকে নিজের পুত্রাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। ইসলামের গৌরব রাখিবার জন্য তিনি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আলিগড়ে অধ্যয়ন কালে উভয় ভ্রাতাকেই তত্রত্য ছাত্রগণ বিশেষ প্রীতি করিত। কলেজে যে কোন আন্দোলন আরম্ভ হইত, এক ভাই না এক ভাই তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। আলিগড় কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মৌলানা মহম্মদ আলি অক্‌সফোর্ডে শিক্ষা লাভার্থ যান। ১৮৯৮-১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ৪ বৎসর কাল তিনি লিন্‌কন্‌স্ ইনে পড়েন; কিন্তু তাঁহার মন আইন অপেক্ষা সাহিত্য চর্চ্চাতেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিল বলিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না।

মৌলানা শৌকত আলি

মৌলানা শৌকত আলি বন্ধু বান্ধব মহলে "বড় দাদা" বলিয়া পরিচিত। কলেজে পাঠকালে শৌকত আলি একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। ক্রিকেট তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় খেলা ছিল। কয়েকবার তিনি কলেজ টীমের কাপ্তেনী করিয়াছিলেন। আলিগড় কলেজ হইতে "ডিগ্রী" লইয়া তিনি চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন, কারণ তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আলির অক্সফোর্ড পড়ার ব্যয় বহন করিতে হইত। তিনি মহম্মদ আলি অপেক্ষা দুই বৎসরের মাত্র জ্যেষ্ঠ হইলেও মহম্মদকে নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। মহম্মদ আলি কোথাও ওজস্বিনী বক্তৃতা করিলে শৌকতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। শৌকত আলিই প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর শৌকতের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস ছিল। মৌলানা শৌকত আলির উৎসাহেই মহাত্মা গান্ধী এদেশে অসহযোগ আন্দোলন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৌলানা শৌকতের জন্যই মুসলমানেরা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। মৌলানা শৌকতের ন্যায় বিরাট বপু বিশিষ্ট লোক কি করিয়া এত কার্য্যক্ষম হন, তাহা সকলের নিকট একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। অসহযোগ আন্দো-

লনের সময় মৌলানা শৌকত আলি ভারতের প্রায় সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই সকলে তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি অতি সরল ও নির্ভীক বক্তৃতা করিতেন।

১৯০২ সালে মহম্মদ আলি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বরোদা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তাঁহাকে বরোদায় আফিম বিভাগে কাজ করিতে হইত, কিন্তু চাকুরীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি দুই বৎসরের ছুটি লইয়া Comrade নামক সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি Times of India, The Hindusthan review এবং Spectator প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহার "Thoughts on the present discontents" নামক প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মর্লে মিণ্টো শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ লইয়া মিঃ গোখেলে ও তাঁহাতে বিশেষ বাদানুবাদ হইয়াছিল। মহম্মদ আলির প্রবন্ধ যেমন সরস তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। সংবাদপত্র সেবা করিতে তাঁহার এত ভাল লাগিত যে, তিনি জাওরা ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তিনি Comrade বাহির করিতেন, কিন্তু ১৯১২ সালে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে তিনি Comrade অফিস দিল্লীতে লইয়া যান। তিনি সংবাদ পত্র পরিচালনে কোন প্রকার শিক্ষালাভ না করিলেও অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পত্রিকাখানি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। শাসক ও শাসিতে সদ্ভাব স্থাপন এবং স্বজাতির সেবা করা তাঁহার কাগজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০৬ সালে যাহাদের চেষ্টায় মুসলমান লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, মহম্মদ আলি তাঁহাদের অন্যতম। মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করাই এই লীগ

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌএর অধিবেশনে মুসলমান লীগ আপন ক্রীড ঘোষণা করেন। "The attainment of Self-Government for India along with the other communities". তদবধি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সহিত একত্রে মুসলমান লীগ ও স্বরাজের দাবী করিয়া আসিতেছে।

অন্তরীণে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মৌলানা শৌকত আলি আলিগড়ে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পুনর্জীবিত করেন। মহামান্য আগা খাঁয়ের সহিত তিনি দেশের সর্ব্বত্র এতদুদ্দেশ্যে চাঁদা তুলিবার জন্য পরিভ্রমণ করেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য অতঃপর মৌলানা সাহেব "হাম্‌দাদ" নামক উর্দ্দু পত্রিকার প্রচলন করেন। অল্পদিনের মধ্যে এই পত্রিকার এত কাটতি বাড়ে যে, অন্যান্য দেশীয় সংবাদপত্রের ৪।৫ গুণ গ্রাহক ইহার হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এই পত্রিকাখানি চক্ষুশূল ছিল এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রচার বন্ধ করেন।

১৯১৩ সালের ৩রা আগষ্ট কাণপুর মসজিদে যে দুর্ঘটনা হয়, সেই দুর্ঘটনা সম্পর্কেই মহম্মদ আলির প্রাথমিক কর্ম্মতৎপরতা প্রকাশ পায়। একটি রাস্তা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাণপুর মিউনিসিপ্যালিটী মছলি বাজার মসজিদের কিয়দংশ ভাঙ্গিবার সঙ্কল্প করেন; পুলিশের সাহায্যে উহা ভাঙ্গাও হয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনতা মসজিদে সমবেত হইয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে এবং পুলিশ জনতার উপর গুলি করে। এ দেশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া ইহার কোন প্রতিকার না পাইয়া মহম্মদ আলি ও সৈয়দ ওয়াজির হাসান ইংলণ্ডে যান। তথায় তাঁহারা প্রধান প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও বহু সভা সমিতি করিয়া গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। অতঃপর বড়লাট স্বয়ং

কাণপুরে আসিয়া মুসলমানদের সহিত আলোচনা করিয়া সন্তোষজনকভাবে বিষয়টির মীমাংসা করিয়া দেওয়ায় সমস্ত গোলমালের শান্তি হয়।

১৯১২ সালে মৌলানা মহম্মদ আলি ও ডাঃ আন্সারী একটি "রেড ক্রেসেণ্ট মিশন" প্রতিষ্ঠা করিয়া তুরস্কে প্রেরণ করেন এবং বলকান্ যুদ্ধে আহত তুর্কীদের সেবা সুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। দিল্লীর কসাইরা একযোগে ধর্ম্মঘট করিলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের গোলমাল মিটাইয়া দেন।

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রেই মহম্মদ আলির প্রতিষ্ঠা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি স্বসমাজের উন্নতি ও তাহাদের অন্তরে প্রজাতন্ত্রের ভাব জাগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কর্ম্মী ছিলেন না। হিন্দু মুসলমানে একতা তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি এক সময় লিখিয়াছিলেন—No friendship can endure long that is not based on mutual confidence and respect. বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমীপে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হয় এবং মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হয়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি হইবে।

মহম্মদ আলি বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির চিরদিন নিন্দাবাদ করিতেন এবং প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় মহম্মদ আলি একজন উচ্চ শ্রেণীর বাগ্মী ছিলেন। বক্তৃতা দ্বারা তিনি শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। সংবাদ পত্র সম্পাদকরূপেও তিনি অতি যোগ্য সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিদ্বেষহীনভাবে সরকারী কাজের সমালোচনা করিতেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার কবিতাসমূহ সমস্তই ধর্ম্মবিষয়ক ছিল।

যখন তুরস্ক মিলিত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন ভারতের মুসলমানেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। তুরস্কের খলিফার

প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের অকপট বিশ্বাস থাকা স্বত্বেও তাঁহারা ইংলণ্ডের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে London Timesএ একটি প্রবন্ধ বাহির হয়, মহম্মদ আলি ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার Camrade পত্রে The choice of the Turks শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তুরস্কের উপর ইউরোপিয়ান শক্তিপুঞ্জ যত অন্যায় করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরোধী না হইলেও তুরস্ক একমাত্র মুসলমান রাজ্য বলিয়া তুরস্ককে ভালবাসিতেন। সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট Comrade ও হামদাদ কাগজের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। অনেকদিন যাবত তাঁহাদের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে আলি ভ্রাতৃযুগলকে অন্তরীণ করা হয়। সমগ্র দেশ-ব্যাপী প্রতিবাদ সভা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট অন্তরীণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না। অন্তরীণে আবদ্ধ থাকাকালে উভয় ভ্রাতাই ধর্ম্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত বহু পুস্তক পড়েন। এই সময়ে মহম্মদ আলি তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতসমূহ রচনা করেন। ১৯১৫-১৬ সালে দিল্লী প্রাদেশিক শাসন বিবরণীতে তাঁহাদের অন্তরীণের কারণ সম্বন্ধে ইহা প্রকাশিত হয়—In the same month (May) was found necessary to intern Mohamad Ali and Shaukat Ali on account of the bad influence which their bitter propaganda against the British Government was having on a section of the Mahommedan Community."

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মিঃ দাদাভাই আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। মিঃ মজহর-উল-হকও সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তদুত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন,—They were persons who were publicly making speaches and writing articles."

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল মজিদকে সিমলা হইতে চিন্দওয়ারায় পাঠান হয়। তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্ত্তের ফরম দেখাইয়া সর্ত্তাধীনে মুক্ত হইবার জন্য বলেন। সর্ত্তের ভাষা এইরূপ ;—

I shall abstain during the remainder of the War from doing, writing or saying anything intended or reasonably likely to encourage or assist the enemies of the king Emperor. I shall also abstain from doing, writing, or saying anything intended or reasonably likely to be construed as an attack upon the allies and friends of the King Emperor. 1 also promise to abstain from any violent or unconstitutional agitation which is likely to affect the public safety.

অর্থাৎ যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন আমি এমন কিছু বলিব না, লিখিব না, কিম্বা করিব না যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের মনে বিরুদ্ধভাব জাগিতে পারে।

কিন্তু আলি ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত সর্ত্তে রাজি না হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত উত্তর দেন ;—

We have always been God-fearing Muslims who accept above all else the commandments of God as conveyed to us in the Holy Quoran and the life and saying of our Prophet. Without prejudice to this faith we have always been law-abiding lovers of our country, opposed to all unconstitutional and violent methods and war or no war, this we always desire and hope to remain. There-

fore we have no objection to give an assurance, if any is still needed, to the effect that without prejudice to our allegiance to Islam we shall abstain from doing, writing or saying anything intended or reasonably likely to encourage or assist the enemies of the King Emperor.

ইহার দুই দিন পরে মামুদাবাদের রাজা বাহাদুর চিন্দওয়ারায় গিয়া আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্ত্তাধীনে মুক্তির প্রস্তাব করেন; কিন্তু তথাচ আলিভ্রাতৃদ্বয় সর্ত্তাধীনে মুক্তি পাইতে চান না। অবশেষে ১৯১৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের রাজকীয় ঘোষণার ফলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ করিয়াই তাঁহারা সরাসরি অমৃতসরে গিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হয়। মহম্মদ আলি সেই কংগ্রেসে পাঞ্জাব লাট স্যার মাইকেল ও'ডারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। মুসলমান লীগের অধিবেশনে তিনি শাসন সংস্কারকে একটা পরীক্ষা (trial) দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। এত নির্য্যাতন সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার কিরূপ অকাট্য বিশ্বাস ছিল ইহা দ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হয়। মুক্তিলাভের পর তাঁহাদের অভাব দেখিয়া দেশবাসী তাঁহাদিগকে কিছু টাকা উপঢৌকন দেন, সেই টাকা তাঁহারা ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য না রাখিয়া সাধারণ কার্য্যে ব্যয় করিতে সংকল্প করেন।

যুদ্ধের সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ ভারতীয় মুসলমানদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানেরা যুদ্ধ করিলে তাহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। যুদ্ধান্তে মিঃ লয়েড জর্জ্জ সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। মুসলমানেরা চাহিয়াছিল যে,

মেসোপটমিয়া,আরব, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি পবিত্র দেশ খলিফার শাসনাধীনে থাকিবে। কিন্তু সন্ধি সূত্রানুসারে তুরস্ককে স্বদেশ হইতে বঞ্চিত করা হয়, থ্রেসকে গ্রীসের হাতে দেওয়া হয় ; গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ে মিলিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লয়। একজন হাই কমিশনার তুরস্কে নিযুক্ত করা হয় এবং তুরস্কের সুলতান নামে মাত্র রাজা থাকেন। ইহাতে মুসলমানেরা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তখন খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধি দল যান, কিন্তু তথায় কাহারও নিকটে কোন প্রকার উৎসাহ পান না। অবশেষে শ্রমিক সদস্যগণ আলবার্ট হল ও কিংস্‌ওয়ে হলে সভার আয়োজন করেন, মৌলানা সাহেব তথায় আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পান। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। তিনি ইংলণ্ডে Muslim outlook এবং প্যারিসে Echo-de-Islam পত্র প্রকাশ করেন।

ইটালীতে গিয়া মহম্মদ আলি মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জানান। অতঃপর ভারতে ফিরিয়া খেলাফত কমিটির নেতৃত্ব লইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিলিত হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তখন দেশময় উপাধি ত্যাগ, সরকারী স্কুল, কলেজবয়কট প্রভৃতির ধুম লাগিয়া যায়। অতঃপর তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য কোটি টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত দুই ভাই মহাত্মা গান্ধীর সহিত সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন।

মৌলানা মহম্মদ আলি ইরোদে খেলাফত কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। সেই কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, লর্ড রেডিং মহাত্মা গান্ধীর

দৃষ্টি ঐ বক্তৃতার দিকে আকৃষ্ট করেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যাত্রা মুক্তি পান। কিন্তু তাঁহাদের দুই ভাই এইরূপভাবে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠেন এবং করাচী খিলাফত কন্‌ফারেন্সে এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন যে, অবশেষে গভর্ণমেণ্ট ১৪ই সেপ্টেম্বর মহম্মদ ও শৌকত আলিকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হন। করাচীর দায়রা বিচারে তাঁহাদের দুই ভ্রাতার দুই বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড হয়। দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর তাঁহারা কারামুক্ত হন। অতঃপর মহম্মদ আলিকে কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করা হয়। ১৯২৪ সালে দিল্লীতে যে সমগ্র দলের মিলন কন্‌ফারেন্স হয়, সেই কন্‌ফারেন্সে মহম্মদ আলি হিন্দু মুসলমান এবং সকল প্রকার রাজনীতিক দলের মিলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলি লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি আপন সমাজের উন্নতির জন্য যাবতীয় সময় নিয়োজিত করিলেও, সাম্প্রদায়িকতা শূন্য ছিলেন এবং অ-মুসলমানদিগকে তিনি ঘৃণা করিতেন না।

মৌলানা মহম্মদ আলি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার জন্য তিনি অকপটে প্রচার করিতেন। উচ্চ শিক্ষার ভার ভারতবাসীর আয়ত্তাধীনে দিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আলিগড়ের মুসলমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার আদর্শানুযায়ী কতকটা কাজ হইতেছে।

ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি বক্তৃতাকালে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেন।

সংবাদপত্র সম্পাদকরূপে তিনি একজন যোগ্য সাংবাদিক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার Commrade পত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সংবাদ পত্র সম্পাদনের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তিনি নির্ভীকভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার কবিত্ব শক্তিও ছিল। তবে তাঁহার কবিতা—আধুনিক কবিদের কাব্যরসের ন্যায় প্রগল্‌ভতা পূর্ণ ছিল না। কবিতার ভিতর দিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

খাঁন বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান

বাঙ্গালার রেজেষ্টারী বিভাগে খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসানের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ তিনি প্রথমে সাব-রেজেষ্ট্রার এবং পরে স্পেশাল সাব-রেজিষ্টার হইতে রেজিষ্ট্রেসন আফিসের ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। সৈয়দ আউলাদ হাসানের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বিস্তৃত জায়গীর ছিল এবং সেই জায়গীর তাঁহারা মোগল ও পাঠান সম্রাট্দের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই বংশ হজরৎ সাহ সৈয়দ জালাল বোখারী হইতে উৎপন্ন। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, কেননা মোগলেরা বোখারী লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ বিদ্বান ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম মোল্লা সৈয়দ হাদি একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, বহু দূর হইতে ছাত্রগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিত। খাঁ বাহাদুরের পিতা পরলোকগত হাকিম সৈয়দ আবুহাসান অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করেন; লক্ষ্ণৌ তখন বিদ্যানুশীলনের জন্য ভারতের মধ্যে প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ কলেজে হাকিমীমতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। লক্ষ্ণৌ কলেজে পাঁচ বৎসরকাল শিক্ষা লাভের পর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন গৃহে অবস্থান করিবার পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতা নগরীতে হাকিমী চিকিৎসা করিয়া-

ছিলেন। কলিকাতার মুসলমান সমাজেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

আমাদের এই জীবনীর নায়ক খাঁন-বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন সমস্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বালকগণকে প্রথমে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় প্রবিষ্ট হন। মাদ্রাসাতেই তিনি প্রধানতঃ ইংরাজী শিক্ষা করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সবরেজিষ্ট্রাররূপে গভর্ণমেণ্ট চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং হাজারিবাগ জেলার বুড়ি নামক স্থানে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। এখানে অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া তিনি একটী হাসপাতাল ও একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতাল ও স্কুল আজিও বিদ্যমান আছে। এই হাসপাতালটি রাণীগঞ্জ ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একমাত্র হাসপাতাল এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া যে সমস্ত পথিক যান, তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইলে এই হাসপাতাল হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালদিগের মনুষ্য গণনা হাঙ্গামা (Census riots) উপস্থিত হইলে খাঁন বাহাদুরের প্রভাবে বুড়ী অঞ্চলের সাঁওতালেরা শান্তভাবে থাকে। কেবলমাত্র বুড়ি অঞ্চলেই কোন হাঙ্গামা হয় না, কাজেই তথায় মানুষ গণনা কার্য্য বেশ শান্তভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বুড়ী হইতে তিনি ঢাকা জেলার শ্রীনগরে বদলী হন। এখানে তিনি মুসলমান বালকদিগের জন্য চারিটী মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা অঞ্চলের মধ্যে এই মক্তব চারিটী সর্ব্বপ্রথমে জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকার স্পেশাল সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। একজন সবরেজিষ্ট্রার এই সর্ব্বপ্রথমে স্পেশাল সব রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হন। ইঁহার পূর্ব্বে বাহির হইতে লোক আনিয়া স্পেশাল রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করা হইত। তিনি এই পদে দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন এবং সরকার ও জনসাধারণের বিশ্বাসলাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সম্মানিত (Honorary) ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি বিচারাসনে একাকী বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জেলা বোর্ডের সভ্য, মিউনিসিপাল কমিশনার, হাসপাতালের কার্য্য নির্ব্বাহক ও মাদ্রাসা এবং মক্তব কমিটির সভ্যরূপে দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রযত্নে মাদ্রাসা শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের জন্য নূতন রেজিষ্ট্রেশন আইন সংগ্রহ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন।

তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সরকার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "খাঁন বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাকে সনদ দিবার সময় তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার বলিয়াছিলেন যে, "আপনি দীর্ঘকাল রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে যে কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার জন্ম ও চরিত্রগত যে সম্মান আছে, তাহাতে আপনি এই সম্মান লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনি স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা শান্ত করিয়াছেন। আপনি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দান করিয়াছেন এবং সেই পরামর্শে আমি অনেক সময় উপকৃত হইয়াছি।

পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইলে খাঁন বাহাদুর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর লইয়াও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি অনেক অবৈতনিক কাজ করিয়াছিলেন এবং অনেক জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের একতা সম্পাদন বিষয়ে তিনি বরাবরই অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। অনেক হিন্দু যুবার তিনি জীবিকা ও উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন এবং অনেক প্রাচীন বিষয়ে তিনি গবেষণাও করিতেন। ঢাকার ইতিহাসে তাঁহাকে সকলেই প্রামাণিক বলিয়া মনে করে। "ঢাকার প্রাচীনত্ব" ও "প্রাচীন ঢাকা" সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিতেন, তাহা চিরদিন সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইবে। তাঁহার "ঢাকার প্রাচীনত্ব" (Antiquities of Dacca) প্রবন্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের নিকটও সমাদৃত। তিনি ঢাকা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল ঢাকায় বক্তৃতাকালে তাঁহাকে একাধিকবার ঢাকার আধুনিক ঐতিহাসিক বলিয়া উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলাদেশের সুন্দর সুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি আছে। "ঢাকা রিভিউ" পত্রে তিনি প্রায়ই ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

খাঁন বাহাদুর গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন সভ্য ছিলেন। শুধু ইহাই নহে; তিনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ঢাকা সাহিত্য সমাজ, আঞ্জুমান-ই-তোরাক্কী-ই উর্দ্দু, নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগ, বাঙ্গালা প্রাদেশিক মুসলমান লীগ, জাতীয় মুসলমান সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা কমিটি প্রভৃতির সভ্য ছিলেন।

স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা

মুসলমান সমাজের অন্যতম অবিসম্বাদী জননায়ক স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিঃ রহিমতুল্লা কাদেরভয় তথাকার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। স্কুলে শিক্ষা লাভার্থ প্রেরিত হইলে স্যার ইব্রাহিম গণিত শাস্ত্রে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শণ করেন। বাল্যকালে ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাতেও তিনি সবিশেষ আমোদ পাইতেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাঁহার অগ্রজের সহিত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রাজনীতির দিকে অধিকতর মনোযোগ দেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের সদস্য পদপ্রার্থী হইয়া নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "জাষ্টিস্ অব দি পীস" হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে সদস্য ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার চেয়ার-ম্যান হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য হন। ২৬ বৎসর কাল তিনি একাদিক্রমে কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯৮-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর কাল তিনি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবত তিনি স্কুল কমিটিরও সদস্য ছিলেন এবং সহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেরিফ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত করেন।

স্যার ইব্রাহিম যখন কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সেই সময় প্রায় প্রতি সিলেক্ট কমিটিতে তাঁহাকে বিল সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য লওয়া হইত। বিশেষভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁহার সুপরামর্শ না হইলে চলিত না। মর্লে মিণ্টো শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী করিয়া মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ ইংলণ্ড যান এবং সেখানে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯১০ সালে তিনি বোম্বাইয়ের নূতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিল উপস্থিত করেন। দেশবাসী যেমন তাঁহার জনসেবা ও স্বজাতি প্রীতি গুণে মুগ্ধ হইতে থাকিল, গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ১৯০৭ সালে তাঁহাকে সি আই ই এবং ১৯১১ সালে তাঁহাকে "স্যার" উপাধি প্রদান করেন। তিনি ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিতে ক্রটী করিতেন না। যখনই সময় পাইতেন তখনই তিনি মুসলমান লীগ, কংগ্রেস, শিল্প কন্‌ফারেন্স ও মুলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন। বোম্বাই সহরের যাবতীয় রাজনৈতিক সভায়ও তিনি যোগদান করিতেন। ১৯০৭—১০ পর্য্যন্ত সমস্ত মুসসলমানেরা কংগ্রেস হইতে তফাতে ছিলেন, সেই সময় স্যার ইব্রাহিম কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ উভয়েই যোগদান করিতেন। ১৯১৩—১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা হইতে দুই বার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই ৫ বৎসরকাল তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। বাজেটের আলোচনাকালে তিনি উহার তীব্র

অথচ যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় Indrustrial commission, The Railwwy committee ও Fiscal commissoin নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা Indian Fiscal Commissionএর প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি শাসন-পরিষদে এমন যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন যে, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার একজন সহকারী সিভিলিয়ান লিখিয়াছিলেন—I feel that I have lost a friend as well as a guide and I shall miss you in a great many ways……I, hope, I shall hereafter be able to put into practice the lessons in practical wisdom that you havs taught me. ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনি শাসন-পরিষদে শিক্ষা ও স্বায়ত্ত শাসনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয় ;—This Council places on record its expression of deep regret at the great loss it has sustained by the retirement of the Hon'ble Sir Ibrahim Rahimtoola K.T,C.I.E."

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকরের মৃত্যু হইলে স্যার জর্জ্জ লয়েডের বিশেষ অনুরোধে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি সভাপতি পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্ণর তাঁহাকে পুনরায় ব্যবস্থাপদ সভার সদস্য মনোনীত করেন এবং এবার তিনি নির্ব্বাচিত সভাপতি হন।

কুমিল্লার ফারুকী বংশ।

কাজী রায়জদ্দীন মহাম্মদ ফারুকী ত্রিপুরা জিলার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত। আরব দেশে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক এই পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ। সেই মহীয়ান খলিফার কোন এক বংশধর ভারতবর্ষে আগমনকরতঃ দিল্লী নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। এই বংশের "ওমর সাহ" নামক এক মহাপুরুষ দিল্লী ছাড়িয়া পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে চলিয়া আসেন। তাঁহার পুত্র আবুল খয়ের ত্রিপুরা জিলায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। নিম্নে এ বংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাজী ওমর সা ফারুকী
" আবুল খয়ের "
" সার ওয়ার "
" অমর খেতাব "
" হবিব উল্লা "
" ইসমাইল "
" সুয়াদদ্দীন "
" আইনদ্দীন "
" আপ্তাবদ্দীন "
" রায়জদ্দীন "
" গোলাম মহিদ্দীন "

কাজী আবুল খয়ের ফারুক সাহ জালাল নামক সুবিখ্যাত পীরের শিষ্য ছিলেন। সাহজালালের সমাধিস্তম্ভ শ্রীহট্ট নগরে অবস্থিত।

অদ্যাবধিও তথায় হিন্দু মুসলমানের ভক্তি অর্ঘ্য অর্পিত হইতেছে। আবুল খয়েরের পৌত্র ওমর খেতাবও একজন ঈশ্বর-ভক্ত কর্ম্মী মহাপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার অলৌকিক কার্য্য কলাপ দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া শ্যাম গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার তাঁহার রূপবতী কন্যা রত্নমালাকে তদীয় শ্রীকরকমলে অর্পিত করেন। মহাপুরুষও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাঁধিয়া রত্নমালাকে আপন সহধর্ম্মিনী করিয়া লন।

এই বিবাহের পর পীর শ্যাম গ্রামের অনতিদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আপন বাসভূমি মনোনীত করিয়া লন এবং তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যার নামানুসারে সেই স্থানের নাম "রতনপুরা" রাখেন। তাই আজ পর্য্যন্তও জন সমাজে সেই গ্রামটী "রতনপুরা" নামে অভিহিত ও সমাদৃত। এখনও রতনপুরায় অনেক ধ্বংশ অট্টালিকা ও মসজিদের ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্ন বক্ষে লইয়া তাহার অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ওমর খেতাবের ঔরসে ও উক্ত ব্রাহ্মণ দুহিতার গর্ভে হবিব উল্লার জন্ম হয়। এতদসন্ধন্ধীয় পুরাতন সনদে দেখা যায় যে, সম্রাট ফরুক সিয়ার কাজী ইসমাইল ও তাঁহার বংশধরগণকে "বলদা খালের কাজী" এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া অনেক নিস্কর জমিদারী দান করিয়া যান।

মুন্সী আপ্তাবদ্দীন ফারুকী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রতনপুরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লার একজন সরকারী উকিল ছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমানের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন তিনি উকীল সম্প্রদায়ের মুখ পত্র ও হিন্দু মুসলমানের নেতৃস্বরূপ ছিলেন, সে কালে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তিনি প্রভূত সাহায্য

করিয়াছিলেন। উক্ত মুন্সী সাহেব অলৌকিক অসামান্য বুদ্ধির প্রভাবে কয়েকটী জমিদারী ক্রয় করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা সহরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই নিদারুণ ঘটনার ফলে সমগ্র সহরে একটা শোকের ছায়া পড়িয়াছিল এবং পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থে সহরের সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী অফিসাদি বন্ধ হইয়াছিল। মুন্সী আপ্তাবদ্দীন সাহেবের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী "রায়জদ্দীন মহাম্মদ ফারুকী"। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জিলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার মানসে কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন।

কাজী সাহেব বাখরগঞ্জ জিলার সম্ভ্রান্ত প্রাচীন সায়েস্তাবাদ পরিবারের সর্ব্বজন সম্মানিত ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য নবাব ইমাদুল মুল্‌ক ইমাদুদোল্লা সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি সি, এস, আই, মহোদয়ের সর্ব্বগুণসম্পন্না ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন।

ত্রিপুরা জিলার জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি সমাজ ও দেশের কল্যাণে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি জেলা বোর্ডের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনার ইত্যাদি গৌরবান্বিত পদগুলি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অনেকবার তিনি মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যানের কার্য্যও করিয়াছিলেন। পরোপকারিতা, অতিথি-সংকার, দানশীলতা ইত্যাদি মহদ্গুণের জন্য এই জিলাবাসীর অন্তঃকরণে আজ পর্য্যন্তও তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। পরোপকার করিতে করিতে তিনি তাঁহার ষ্টেটে ১৫০০০০৲ দেড় লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া যান। তাঁহার বিপুল দানের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য দানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	ফুলার ইস্‌লামিয়া হোষ্টেল কুমিল্লা	১১০০০৲
২।	সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা	১২০০০৲
৩।	বরিশাল মোসলেম্‌ ইনষ্টিটিউসন	১৫০০৲
৪।	আলিগড় ইউনিভারসিটি কলেজ ফণ্ড	১২৫০০৲
৫।	হায়দারাবাদ বন্যা বিপন্ন নর নারীর সাহায্যার্থ	৪০০০৲
৬।	কুমিল্লা মসজিদ নির্ম্মাণ	১২০০০৲
৭।	কুইন ভিক্টোরিয়া স্মৃতি ভাণ্ডার	২০০০৲
৮।	সম্রাট এড্‌ওয়ার্ড স্মৃতি ভাণ্ডার	৬০০০৲
৯।	দেবীদ্বার তিনটী পুষ্করিণী ও খাল খনন	৫০০০৲
১০।	কোম্পানীগঞ্জ " "	১০০০৲
১১।	শ্রীমন্তপুর ২টী " "	৪২০০৲
১২।	কুমিল্লায় ৩টী " "	২৩০০৲
১৩।	কুমিল্লা দাতব্য চিকিৎসালয়	৬০০০৲
		৭৯৫০০৲

এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক দরিদ্র হিন্দু মুসলমান ভদ্রপরিবারকে গোপনে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি অনেক বাবু যাহারা বর্ত্তমানে সহরে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের জীবন-যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক কাজী সাহেবের সাহায্যে আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি অনেক যুবকগণকে শিক্ষার মানসে ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজ সাহায্যে পাঠাইয়াছিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে কাজী সাহেব নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ মূহুর্ত্ত মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে হায় হায় রবের প্রতিধ্বনি

করিয়াছিল। তিনি এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন যে যখন তাঁহার "শবাধার" বাহিত হইয়া সমাধিস্থানের দিকে চলিতে থাকে সেই সময় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কুমিল্লার অধিকাংশ লোকই তাঁহার শব দেহের অনুগমন করিয়াছিল। সে দিন বাস্তবিকই কুমিল্লা নগরী এক বিস্ময়কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, প্রতি ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন প্রতিফলিত হইয়াছিল, ঐদিন সমস্ত আফিস আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য সহানুভূতিসূচক পত্রাদি আসিয়াছিল।

তিনি ৫ পাঁচটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যাকে সুবিখ্যাত আদি জমিদার সৈয়দ আকমল খাঁর পৌত্র সৈয়দ আহাম্মদ বক্তের সহিত বিবাহ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যাকে যথাক্রমে ঢাকার মীর আশরফ আলী সাহেবের পৌত্র সৈয়দ মহম্মদ শরিপ ও সৈয়দ মুজাফর সাহেবদ্বয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। চতুর্থ কন্যাকে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সদস্য মহম্মদ ইছমাইল খাঁ চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। পঞ্চম কন্যাকে বামনার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আপছরদ্দীন চৌধুরীর পুত্র ফখরুদ্দীন চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। কাজী সাহেবের একমাত্র পুত্র তাঁহার নাম দি অনারেবল নবাব স্যার মহীউদ্দীন ফারুকী কে টি। তিনি নবাব অব রতনপুর, মিনিষ্টার গবর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল, লীডার অব্ দি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল। তাঁহার সহিত ময়মনসিংহের প্রতিভাশালী সর্ব্বজন সম্মানিত ইম্‌পিরিয়েল কাউন্‌সিলের ও বঙ্গের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য নবাব স্যার এ কে গজনবী সাহেবের প্রথমা কন্যার বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাঁধিয়া যান।
